ভূমিকা

ভারি বই, তার আবার ভূমিকা—কাণা-ছেলের নাম পদ্মলোচন! কথাটা ঠিক্, কিন্তু বাপমায়ের মনে কি সে কথা বলে? সেইজন্যই এই নামমাত্র ভূমিকা।

আরও একটা কথা আছে; এ "নূতন গিন্নী" আমার নহে, পাঠক-পাঠিকা পাড়া খুঁজিলেই এ গিন্নীর সন্ধান পাইবেন। আমার লাভ অভিসম্পাত;—খেয়াঘাটে দাঁড়াইয়া তাহাতেও ভয়ের বিশেষ কারণ নাই।

১ লা আশ্বিন
১৩১৪

শ্রীজলধর সেন।

দ্বিতীয় সংস্করণ

দশ বৎসর পরে দ্বিতীয় সংস্করণ;—তা দশই হউক আর কুড়িই হউক, "নূতন গিন্নী" নূতনই আছেন;——বয়স বাড়িলে কি হয়—অঙ্গার শত ধৌতেন—; অতএব ঘসা-মাজা নিতান্তই নিরর্থক।

কলিকাতা
জ্যৈষ্ঠ—১৩২৪

শ্রীজলধর সেন।

শ্রীযুক্ত কুমার শরৎকুমার রায় এম-এ, মহাশয়

করকমলেষু—

নূতন গিন্নী

আমি এখন চাকুরী করি। বহুবাজারের মিত্রদের বাড়ীতে একটি দশ বৎসরের ছেলেকে দুইবেলা পড়াই;—সেইখানেই থাকি, খাই এবং মাসান্তে পোনেরটি করিয়া টাকাও পাই।

আজ ছাব্বিশ বৎসর চাকুরীর ভাবনা ছিল না, অন্নচিন্তাও ছিল না। এখন দুই বেলা দুই মুষ্টি অন্নের জন্য আমি পরের দ্বারস্থ। আমার দাদার অন্ন কত জনে খাইতেছে!

দাদা হাইকোর্টের বড় উকিল; মাসে আড়াই হাজার তিন হাজার টাকা রোজগার করেন। আমিই তাঁহার একমাত্র সহোদর। বুদ্ধি পড়িয়া অবধি তাঁহারই অন্ন খাইয়াছি;—আজ ছাব্বিশ বৎসর খাইয়াছি,—তাঁহারই পত্নীর স্নেহের ক্রোড়ে মানুষ হইয়াছি। চারি বৎসর বয়সের সময় মা মরেন; দাদার বয়স তখন বাইশ বৎসর। আমি দাদার আঠারো বৎসরের ছোট। মার মৃত্যুর পরেই বাবা মুন্সেফী হইতে অবসর লইলেন;—দুই বৎসর যাইতে না যাইতেই তিনি স্বর্গে চলিয়া গেলেন। ছয় বৎসর বয়সে পিতৃমাতৃহীন;—কিন্তু বাপমায়ের অভাব কোন দিন বুঝি নাই; বৌদিদির কাছে মায়ের আদর, দাদার কাছে পিতার স্নেহ পাইয়াছি। বাপমায়ের বুড়া বয়সের ছেলে আমি,—বড়ই আদরের ছিলাম; বৌদিদি, বড় দাদা সে আদর রক্ষা করিয়াছিলেন—পিতৃমাতৃহীন কনিষ্ঠ ভ্রাতার সকল আব্দার তাঁহারা সহিতেন।

আমার লেখাপড়ার জন্য দাদা যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। ভবানীপুরে বাড়ী, বাবা কিছু রাখিয়া গিয়াছিলেন, দাদাও ধীরে ধীরে আলি-

পুরে পসার করিতেছিলেন ; তেমন অভাব কিছুরই ছিল না। বৌদিদির সন্তান ছিল না ; আমিই তাঁহার সন্তানের সাধ মিটাইতাম। পড়াশুনার জন্য দাদা তাড়না করিলে বৌদিদির অঞ্চলের ছায়ায় গিয়া দাঁড়াইতাম ; —জানিতাম সে দুর্গে আশ্রয় লইলে আলিপুরের উদীয়মান উকীল শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ বসু এম, এ, বি, এলের সাধ্যও নাই যে, সেখানে অগ্রসর হন। সমন, ওয়ারেণ্ট, মাল-ক্রোক—কিছুতেই সেখান হইতে আসামী গ্রেপ্তার করিবার যো ছিল না। বৌদিদির দখলের মধ্যে মা-সরস্বতী যতটুকু অনধিকার প্রবেশ করিয়াছিলেন, আমার বিদ্যাও তত-টুকুই হইয়াছিল। আমি তিন—তিন বার এণ্ট্রেন্স ফেল করিয়া পড়া ছাড়িয়া দিলাম ;—দাদা বলিলেন "লক্ষ্মীছাড়াটা বাপ-দাদার মুখ হাসাইল।" বৌদিদি মুখ ভার করিয়া কথাটা সহিয়া লইলেন। তিনবার যে কায়েতের ছেলে এণ্ট্রেন্স ফেল করে, তাহার পক্ষ হইয়া রাসবিহারী ঘোষও যখন মামলা জিতিতে পারেন না—বৌদিদি ত জুনিয়ার উকীলের পত্নী !

(২)

মনে করিয়াছিলাম বৌদিদির স্নেহের ষোল আনা মালিক ও দখলি-কার হইয়াই এ জীবনটা কাটাইব ; কিন্তু তাহা হইল না। আমি যেবার প্রথম এণ্ট্রেন্স ফেল করি, সেইবার কোন্ এক অজ্ঞাত দেশের এক নন্দনকানন হইতে একটা দেবশিশু আসিয়া একদিন বৌদিদির কোলে বসিল,—আমাদের সমস্ত বাড়ীটা সেই একটুখানি শিশুর আগমনে আনন্দপূর্ণ হইয়া গেল। বৌদিদির কোলে খোকা !—সে যে কেমন সুন্দর দৃশ্য, তাহা আমি বলিতে পারিব না—তোমরা কোন কবিও কোন দিন পার নাই।

এতকালের ভোগদখলী সম্পত্তিতে একজন অংশী—অংশী কেন, ষোল আনার মালিক—আসিয়া জুটিল, ইহাতে আমার একটুও ক্ষোভ হইল না। দ্বিতীয় দিনে সূতিকাগারে যখন খোকাকে দেখিলাম, তখন আমি বিনা নালিসে, বিনা শালিসে আমার পাকা দখলিস্বত্ব অম্লানবদনে ছাড়িয়া দিলাম; বাড়ীতে বিনা পয়সার উকিল থাকিতেও আমি স্বত্ব-রক্ষার চেষ্টা করিলাম না। ত্যাগের কি মূর্ত্তিমান আদর্শ—এই আমি!

প্রথম-বারের এণ্ট্রেন্স পরীক্ষায় যে ইতিহাস ও ভূগোলে আমি ফেল হইয়াছিলাম, তাহার জন্যে আমিই দায়ী; কিন্তু দ্বিতীয় বৎসরে দুই বিষয়ে এবং তৃতীয় বৎসরে যে তিন বিষয়েই ঢেরাসহি হইয়াছিলাম, তাহার জন্য আমি বা কতটুকু দায়ী, আর আমার সেই ক্ষুদে ভাইপোটী কতখানি দায়ী, তার একটা নিষ্পত্তি এ জগতের মহা প্রিভিকাউন্সিলেও হইবার যো নাই। খোকাকেই আদর করিব, না মাদাগাস্কারের উৎপন্ন-দ্রব্যের তালিকা মুখস্থ করিব; খোকার স্বর্গের প্রশ্নেরই সমাধান করিব, না জিওমেট্রির উদ্দেশ্য মুখস্থ করিব; মা-সরস্বতীর বরপুত্রেরা হিষ্ট্রী ও জিওমেট্রিই জন্ম-জন্ম ঘাঁটিতে থাকুন, আমার খোকাই ভাল। কিন্তু এত করিয়াও ত তাহাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিলাম না। সেই দুঃখের কথা, সেই শক্তিশেলের যন্ত্রণার বিবরণই ত এই দিবা দ্বিপ্রহরের অবকাশে লিখিতে বসিয়াছি;—আমার ছাত্রটী স্কুলে গিয়াছে।

(৩)

খোকার নামকরণ লইয়া মহা বিভ্রাট বাধিল; দাদা অনেক নভেল ও দুই তিনখানি অভিধান তন্ন তন্ন করিয়া খোকার জন্য তিনটি নাম আমাদের দরবারে পেশ করিলেন—রবীন্দ্র, সুরেন্দ্র ও মহেন্দ্র। আমি তিনটাই নামঞ্জুর করিলাম। রবীন্দ্র!—ও বাবা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের

মত যদি খোকা কবি হইয়া বসে, তাহা হইলে আমার যে কাকাগিরি রক্ষা করাই দায় হইবে,—ও নাম কাজ নাই। সুরেন্দ্র বাঁড়ুয্যের কথা ভাবিয়াই দাদা হয় ত সুরেন্দ্র নামটা আঁচিয়াছিলেন ;—তা ভাই গরীব উকিলের ছেলের অতটা স্বদেশী হইয়া কাজ নাই—শেষ ত রীপণ কলেজ ! মহেন্দ্র সরকার লোকটা সার্থকজন্মা বটে,—কিন্তু আমার ভাই-পো নাড়ী টিপিবে ?—নো—নেভার ! বৌদিদি চিরদিনই আমার দিকে—দাদা একটা ভোটও পাইলেন না ; শেষে বলিলেন "তবে তোর মত একটা নামকাটা সেপাইয়ের নামই রাখ্। ভাইপোর বিদ্যাও কাকার মতই হবে।" এইবার বৌদিদি কথা বলিলেন ; বলিলেন "ওগো, রক্ষা করুন বিদ্যাসাগর মশাই। এমন বিদ্যাসাগর হোয়ে দিন রাত্রি মিথ্যার ব্যাপার করার চাইতে আমার দেওরের মত এণ্ট্রেন্স ফেল হোয়ে থাকাও ভাল। মিথ্যা কথার জাহাজ !"

"বলি এই জাহাজে চোড়েই ত ভবসমুদ্র পার হোচ্চো !" বৌদিদির সঙ্গে কথায় আঁটিয়া উঠার যো নাই, তিনি বলিলেন, "আমি কি চড়ন্দার, আমি যে জাহাজের কর্ণধার। কর্ণ ধরিব কি ?"

আমি দেখিলাম, ভাল রে ভাল ; কোথায় বা খোকার নামকরণ, আর কোথায় বা ভদ্রলোকের শ্রবণেন্দ্রিয়-ধারণ। দাদা আর বৌদিদির মধ্যে এমন কথা-কাটাকাটি দিবারাত্রই চলিত ;—যেমন দাদা তেমনই বৌদিদি !

আমি তখন কথাটা আসল স্থানে লইয়া যাইবার জন্য বলিলাম "খোকার একটা বাঁধাবাঁধি নামে কাজ নাই ; যখন যা মনে আসবে তাই বোলেই ডাকা হবে ; এই ধর না, টোনা, মোনা, চাঁদ, ননি, যাদুধন—নামের অন্ত থাক্‌বে না।" খোকার নামের গোল আর

মিটিল না—তবে আর সকলেই তাকে "সখা" বোলে ডাক্‌ত। সখা নামটি বেশ—কি বল ?

এইবার এক বিষম সমস্যায় পড়া গেল। দাদার বেশ পসার হইয়াছে। তিনি আর আলিপুরে নাই, এখন হাইকোর্টের উকিল; পয়সা-কড়িও বেশ পান। বৌদিদি আর আমি দুই-হাতে খরচ করি—দাদা একটা কথাও বলেন না। কিন্তু এমন করিয়া ত দিন চলে না। বৌদিদি দাদাকে ধরিয়া বসিলেন যে, তাঁহার দেবর লক্ষ্মণের জন্য একটি উর্ম্মিলার প্রয়োজন। দাদার তাহাতে অমত নাই ; কিন্তু আমি একেবারে ভীষ্মের পণ করিয়া বসিলাম। বিবাহ !—ও কাজটা আমার দ্বারা হইতেছে না ; অমন দুষ্কর্ম্ম, দোহাই বৌদিদি, আমি করিতে পারিতেছি না। বিনা অপরাধে এই এণ্ট্রেন্স ফেল গরীবের উপর এমন কঠোর দণ্ড দিতে নাই। বৌদিদি আমাকে কিছুতেই পারিয়া উঠেন নাই। আমার অকাট্য যুক্তি—"এক পরের মেয়ে ঘরে আসিয়াই ত এই ; তবু যা হোক ঘরে মাথা দিয়ে আছি। আবার আর একজন আসুক, তখন আজ এটা, কা'ল সেটা, তারপরদিন কুরুক্ষেত্র, তারপরে চক্রব্যূহ। এ কর্ম্ম কিছুতেই কোরো না বৌদিদি ! আমি বেশ আছি। তুমি আছ, খোকা আছে, দাদা আছে। সংসারে আর চাই কি ?"

বৌদিদি বলিলেন—"চাই একখানি পরেশ পাথর। যাতে তোমার মত রাং ঠেকাইলেও সোণা হয়।"

"সোণা হোয়ে কাজ নাই, আমি রাংই থাকি।"

বৌদিদিকে এক্ষেত্রে পরাজয় স্বীকারই করিতে হইল ; আমি তাঁহাকে মায়ের মত ভক্তি করি ; কিন্তু তাঁহার এ আদেশ আমি কিছুতেই মানি নাই।

এই ভাবে দুই বৎসর কাটিয়া গেল—খোকার বয়স দুই বৎসর

হইল। আমার আর কোন কাজ নাই, দিনরাত্রি শুধু খোকা। খোকা মা চায় না, বাপ চায় না,—চায় শুধু কাকা। কাকার বুকে না হোলে তার ঘুম হয় না, কাকার সঙ্গে না বোস্‌লে তার খাওয়া হয় না। আবার কাকারও কি হইল; তার দুধের বাটীর মধ্যে যদি তরকারী কি মাছের ঝোল না পড়ে, ত সে দুধ মিষ্টই লাগে না। খোকা যদি পাতের উপর একটা ওলটপালট না করে, তাহা হইলে সে দিন ভাত খাইয়া আমার পেট ভরিত না। সংসারে কত জনের কত বিষয়ে কত সাধ থাকে—আমার সকল সাধ খোকা। খোকার জিনিস কিনিবার টাকা যোগাইতে-যোগাইতে দাদা একেবারে অতিষ্ঠ হইয়া গেলেন—কিন্তু কথা কহিবার যো নাই। কত পুণ্যফলে এমন দাদা পাইয়াছিলাম;—আর এখন সেই দাদা—বলিতেও বুক ফাটিয়া যায়!

(৪)

বড় সুখের সময় মনে হয়, চিরদিন বুঝি এইভাবেই যাইবে—আর কোন দিন দুঃখ বা বিপদ আসিবে না। আমিও তাহাই ভাবিয়াছিলাম। হঠাৎ একদিন আমার সে ভ্রম ঘুচিয়া গেল। একদিন প্রাতঃকালে বৌদিদির কলেরা হইল; সহরের যত ভাল ভাল ডাক্তার সকলেই আসিলেন—সারাদিন যমের সহিত যুদ্ধ চলিল; কিন্তু সবই বৃথা হইল;—রাত্রি আটটার সময় সতী সাধ্বী স্বামীর কোলে মাথা রাখিয়া—দুই বছরের সোণার চাঁদকে আমার কোলে তুলিয়া দিয়া—স্বর্গে চলিয়া গেলেন। এতদিনে মায়ের শোক আমার বুকে বাজিল। দাদা কয়েক দিন হাইকোর্টে যাওয়া বন্ধ করিলেন—আমি বড়ই অধীর হইয়া পড়িতাম; কিন্তু কি করিব, বৌদিদি যে তাঁর খোকাকে আমারই কোলে রাখিয়া গিয়াছেন। চক্ষের জল মুছিয়া খোকাকে কোলে তুলিয়া লইলাম।

আমাদের আনন্দের পুরী সেই যে আঁধার হইল, আর তাহা ঘুচিল না ;—এখন ত ঘোর অমাবস্যা !

বৌদিদির মৃত্যুর পর পাঁচ ছয় মাস কাটিয়া গেল। দাদা আবার হাইকোর্টে বাহির হইতে লাগিলেন ; আমিও খোকার মুখের দিকে চাহিয়া বৌদিদির শোক ক্রমে ভুলিতে লাগিলাম।

বাড়ীতে স্ত্রীলোক কেহই নাই—আমরা যেন ঠিক হোটেলে থাকি ; কোন রকমে দিন চলিয়া যায়। বাড়ীর ভিতর একেবারে অন্ধকার। দাদা দেখিলেন এমন ভাবে বাস করা অসম্ভব ; তাই তিনি আমার বিবাহের প্রস্তাব করিলেন ; বলিলেন "যা হবার তা ত হইয়া গেল। এখন ছেলেটিকে মানুষ করা ত চাই। তুই আর দিনরাত এমন করিয়া খোকাকে কতদিন রাখবি। আমি আর বিলম্ব করিতে পারি না, এখন তোকে বিবাহ দিয়া একটা গৃহস্থালী পাতিয়া দিলেই আমি নিশ্চিন্ত হই। তার পর খোকা আছে, আর তুই আছিস্। তুই ত আর কাজ-কর্ম্ম কিছুই শিখ্‌লি না ; তা তোকে কিছু ক'র্‌তেও বলি না। আমি যে কয়দিন বাঁচি, সে কয়দিন তোদের জন্যই খাটিব। তা মা-বাপের আশীর্ব্বাদে এখন যা আছে, আর কিছুদিন যদি বাঁচি, তা হোলে আরও যা কিছু সঞ্চয় কোর্‌তে পারব, তাতে তোদের চাকুরী কোরতে হবে না ; বুঝেসুঝে চোল্‌লে কোন দিনই কষ্ট হবে না।"

আমি দাদার কথায় কোনই উত্তর দিলাম না। দাদা মনে করিলেন, মৌনই সম্মতির লক্ষণ। তাই তিনি বলিলেন "আস্‌ছে শনিবারেই আমি একবার হুগলী যাব ; সেখানে নাকি একটা ভাল মেয়ে আছে ; দেবে-থোবে ভালই ; আর মেয়েটিও খুব সেয়ানা। সব দিকেই ভাল। সেইটেই পাকা কোরে আস্‌ব, কি বলিস্ ?"

আমি আর চুপ করিয়া থাকা সঙ্গত মনে করিলাম না, বলিলাম

"দাদা, আর ওসব জঞ্জালে কাজ নাই। আমাদের অদৃষ্টে যদি সুখ থাকতো, তা হোলে বৌদিদি আমাদের ফেলে পালাতো না।"

দাদা বলিলেন, "তা বোলে কি সংসারটা এমনই শ্মশান হ'য়ে থাক্‌বে। তোর আপত্তি খাট্‌বে না। আমি যা হয় একটা কোরেই আস্‌বো।"

দাদার দৃঢ়তা দেখিয়া আমি চুপ করিয়া থাকিলাম ; মনে করিলাম, এখনও সময় আছে। দাদা কি আর তাড়াতাড়িই যা হয় একটা করিয়া বসিবেন।

দাদা হুগলীতে গেলেন। শনিবারে বিকালে গেলেন, রবিবার সন্ধ্যার সময় ফিরে এলেন। আমাকে আর কোন কথা বোল্‌লেন না', আমিই বা কি জিজ্ঞাসা কোর্‌বো। তার পরে দেখি, দুই চারিজন অপরিচিত লোক আমাদের বাড়ীতে যাওয়া-আসা কোর্‌তে লাগ্‌লেন ; দাদার সঙ্গে গোপনে কি পরামর্শ চোল্‌তে লাগ্‌লো। আমি আর কিছু বুঝিতে পারি না—জিজ্ঞাসাও করিতে পারি না। শেষে একদিন দাদা আমায় ডেকে বোল্‌লেন "দেখ্‌ শরৎ, তোর ত দেখ্‌ছি বিয়ে কর্‌তে ঘোর অনিচ্ছা। এদিকে খোকার দেখ্‌বার-শুন্‌বার একটা কেউ না হোলে ত আর চলে না। অনেক ভেবে চিন্তে শেষে স্থির করেছি, খোকার জন্যই আমাকে আবার সংসারী হ'তে হ'বে। ছেলেটির মুখের দিকে চাইবার লোক ত চাই।"

আমি একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেলাম! দাদা যে এমন প্রস্তাব করিবেন, তাহা আমি একদিনও মনে করি নাই। এই সেদিন বৌদিদি মারা গেলেন ; আব এই কয় মাসের মধ্যেই দাদা সব ভুলিয়া গেলেন! ছেলেটা যে পর হইয়া যাইবে, তাহাও ভাবিলেন না। হায় মানুষ! হায় মানুষের ভালবাসা! বুঝিলাম এতদিন পরে এ সংসারে আমাদের স্থান

থাকিবে না। খোকার জন্যই আরও ভাবনা হইল। খোকার বিমাতা ঘরে আসিবে; সে খোকাকে দেখিতে পারিবে না; সে খোকাকে কষ্ট দিবে—হয় ত বা মারিয়াই ফেলিবে;—আমি এক মুহূর্ত্তের মধ্যে এত কথা ভাবিয়া ফেলিলাম। ঐ ব্যাপারগুলি যেন ভবিষ্যৎ তাহার কৃষ্ণ-যবনিকা অপসারিত করিয়া আমার চক্ষের সম্মুখে ধরিল; আমি শিহরিয়া উঠিলাম। মনে হইল এখনই খোকাকে লইয়া এখান হইতে পলায়ন করি। হায় হায়, তাই যদি করিতাম!

আমার মুখের ভাব দেখিয়াই দাদা সব বুঝিলেন; তিনি বিষণ্নমুখে উঠিয়া গেলেন। তাতে কি আর বিবাহ বন্ধ থাকে। আমার বিবাহের জন্য হুগলীতে যে মেয়ে দেখিতে গিয়াছিলেন, একদিন তাহাকেই আনিয়া দাদা বৌদিদির ছয়মাসের শূন্য সিংহাসনে বসাইয়া দিলেন। ভৃত্য হরিদাস খোকাকে বলিল "খোকা বাবু, তোমার নূতন মা এসেছেন।" খোকা বলিল "দুষ্ট ছেলে, মিথ্যা বলে।" সাড়েতিন বৎসরের খোকা মিথ্যা-মা চিনিয়া ফেলিল।

দাদার এই পরিবারটী বয়সে ষোল সতর হইলেও একেবারে পাকা গৃহিণী। ভগবান দাদার স্কন্ধের উপর তাহাকে বসাইবেন জানিয়াই তাহাকে গোড়া হইতেই গৃহিণীপনার শিক্ষানবিশী করাইয়াছিলেন। দাদার স্ত্রী মাস দুইয়ের মধ্যেই বেশ গোছাইয়া-গাছাইয়া নিজের স্থান অধিকার করিয়া লইলেন। সুধু তাই নহে, এই বসুপরিবারের মধ্যে লক্ষ্মীছাড়া শরৎপ্রসাদ বসুর যে কিঞ্চিৎ অধিকার ছিল, তাহাও তিনি দখল করিয়া বসিলেন। ক্রমে দেখিতে লাগিলাম দাদাও ধীরে-ধীরে তাঁহার কর্তৃত্ব হইতে অপসারিত হইতেছেন। বুঝিলাম, এ সংসারে এই লক্ষ্মীছাড়া অকর্ম্মণ্য কাকা ব্যতীত খোকার আর গতি থাকিবে না;—বুঝিলাম আর দাদার ভাইগিরি করা এ সংসারে পোষাইবে না। আমি একেবারে

হইলে কোন ভয় ছিল না—কোন ভাবনা ছিল না—যেখানে-সেখানে যেমন-তেমন করিয়া আমার দিন কাটিয়া যাইত। কিন্তু খোকাকে মানুষ করিতে হইবে;—সুধু বাঁচাইয়া রাখা নয়, শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ বসু এম এ, বি, এল মহাশয়ের ছেলের মত মানুষ করিতে হইবে। যাক্, কায়েতের ছেলে, সামান্য একটু লেখাপড়াও ত শিখিয়াছি; ভয় কি—এ বাড়ী ছাড়িয়া যাইব—এ দেশ ত্যাগ করিব;—দূরদেশে গিয়া সামান্য কাজ করিয়াও খোকাকে মানুষ করিব। খোকার গায়ে কাঁটার আঁচড়ও লাগিতে দিব না। যে দিন খোকার সামান্য একটু অযত্ন দেখিব—যে দিন দাদার মুখে একটু বিরক্তির ভাব দেখিব, সেই দিন এ পাপ পুরী ত্যাগ করিয়া যাইব।

খোকা আমার কাছেই থাকে;—এতকালও ছিল, এখনও থাকে। দাদা সর্ব্বদাই তত্ত্ব লন; পূর্ব্বের মতই যত্ন করেন। দাদার স্ত্রীর যত্নের আশাই যখন আমরা করি নাই, তখন তাঁহার কথার আর কি উল্লেখ করিব। মনে করিলাম, দাদা যদি ঠিক থাকেন, তাহা হইলে আর ভয় কি। কিন্তু আমরা মনে করিলেই যদি কাজ হইত, তাহা হইলে আর দুঃখ কি ছিল। কে একজন অলক্ষ্যে বসিয়া কল ঘুরাইতে লাগিল, আর দিনে-দিনে দাদা যেন দূরে যাইয়া পড়িতে লাগিলেন। তাহার ফলে আমরা বৈঠকখানার পাশের ঘরে আসিয়া পড়িলাম, অন্দর-মহলের সহিত আমাদের সম্পর্ক ক্রমেই লোপ পাইতে লাগিল। কেন বলিতে পারি না, এ সকল অনাদরও সহিতে লাগিলাম। প্রথম আবেগে মনে করিয়াছিলাম, একটু সামান্য ত্রুটী দেখিলেই খোকাকে লইয়া এ বাড়ী ত্যাগ করিব; কিন্তু সে প্রথম আবেগ চলিয়া গেলে ধীরে-ধীরে অনেকটা সহিয়া লইলাম—অনাদর অবজ্ঞাও যেন কেমন সহিয়া গেল। এখন মনে হইত, খোকাকে প্রতিপালন করিবার যোগ্যতা আমার নাই; আর আমি

লইয়া যাইতে চাহিলেই বা দাদা তাহাকে ছাড়িয়া দিবেন কেন? থাকি—এই বাড়ীতেই থাকি। দাদার যত অবজ্ঞা, যত অশ্রদ্ধা মাথা পাতিয়া লইব—খোকাকে আমার বুকের মধ্যে রাখিব; তাহার গায়ে কোন আঁচ লাগিতে দিব না।

তা কি হয়! তুমি আমি অনেক সহিতে পারি; কিন্তু শিশুর কোমল হৃদয় একটু অনাদরে, সামান্য একটু উপেক্ষায় মলিন হইয়া যায়। শিশু অতি অল্পেই আদর অনাদর বুঝিতে পারে;—আমার মনে হয় শিশুই ঠিক মানুষ চিনিতে পারে—তোমরা আমরা চিনিতে পারি না। দাদা যে ক্রমে-ক্রমে পর হইয়া যাইতেছেন, দাদার আদর যে কমিয়া যাইতেছে, খোকা হয় ত তাহা বেশ বুঝিতে পারিয়াছিল। তাই সে দিনে-দিনে শুকাইয়া উঠিতে লাগিল। আমি দাদাকে একদিন বলিলাম যে, খোকা দিনে-দিনে রোগা হইয়া যাইতেছে। দাদা বলিলেন, "ও কিছু নয়; খুব খেলা করিয়া বেড়াইলেই সারিয়া যাইবে; তুই ওকে মোটে দৌড়াদৌড়ি করিতে দিস্ না, তাই ও অমন হইয়া গিয়াছে।" এ কথার আর কি উত্তর দিব? নীরবে একবিন্দু চক্ষের জল ফেলিলাম।

একদিনও সহিল না। যেদিন দাদার সঙ্গে কথা হইল, সেই রাত্রেই খোকার জ্বর হইল। ক্রমেই জ্বর বাড়িতে লাগিল; শেষরাত্রে দাদাকে খবর দিবার জন্য নিজেই বাড়ীর ভিতর গেলাম। দাদার শয়নঘরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ডাকিলাম "দাদা, দাদা!" দাদা বোধ হয় তখন জাগিয়াই ছিলেন, উত্তর দিলেন "কে, শরৎ, এত রাত্রে কেন?" আমি অতি কাতরকণ্ঠে বলিলাম, "দাদা, একবার উঠে এস, খোকার বড় জ্বর হয়েছে।" দাদার কণ্ঠস্বর দ্বিতীয়বার শুনিবার পূর্ব্বেই আর একটী কণ্ঠস্বর শুনিলাম "জ্বর হয়েচে, তার কি হবে। রাত পোহাক্, তখন ডাক্তার ডাক্‌লেই হবে। সবই বাড়াবাড়ি।" কথা কয়টী আমার কাণে

গেল। তখন দাদা বলিলেন "শরৎ, তুই খোকার কাছে যা, আমি আস্‌ছি।" আমি আর বাক্যব্যয় না করিয়া নীচে নামিয়া আসিলাম—মনে করিলাম, দাদা হয় ত রাত্রে আর আসিবেন না। খোকার নিকট আসিয়া বসিলাম; দ্বারের দিকে চাহিয়া রহিলাম—দাদার আসিতে বিলম্ব হইল। তখন আর কি করিব, খোকার শিয়রে বহুদিনের চাকর হরিদাস বসিয়া ছিল; তাহাকে বলিলাম "হরি, যা শীঘ্র অমৃত ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে আয়; যত টাকা লাগে আমি দিব।" হরি তখনই একটা লণ্ঠন হাতে করিয়া চলিয়া গেল। টাকার অভাবে খোকার চিকিৎসা হইবে না? কেন, এ বাড়ীতে আমার অংশ আছে; তাহাই বেচিয়া ডাক্তারের ধার শোধ দিব। এই কথা ভাবিতেছি, আর খোকার গায়ে মুখে হাত বুলাইতেছি; এমন সময় দাদা নীচে নামিয়া আসিলেন। খোকার গায়ে হাত দিয়া বলিলেন "কৈ, জ্বর ত বেশী নহে।" আমার আর সহ্য হইল না; আমি তখন ভুলিয়া গেলাম তিনি আমার বড় ভাই, আমরা এক মায়ের পেটের সন্তান। আমি কঠোর স্বরে বলিলাম "না, খোকার জ্বর বেশী নয়। তুমি উপরে যাও; তোমার সুখের ব্যাঘাত কেন আমরা হই। যেদিন বৌদিদি গিয়েছে, সেইদিনই তোমার আশা আমরা ছেড়ে দিয়েছি। জ্বরের জ্বালায় ছেলে ছট্‌ফট্ করছে, আর তুমি বোল্‌ছো, কৈ জ্বর বেশী নয়! যাও, তোমার মত বাপের দয়ায় ছেলে বাঁচার চাইতে ওর মরণই ভাল।"

দাদা আর কথা বলিলেন না; খোকার শিয়রে বসিয়া তাহার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন। একবার ইচ্ছা হইল দাদাকে ঘরের বাহির করিয়া দিই; খোকার পবিত্র শরীর তাহাকে স্পর্শ করিতে দিব না। পরক্ষণেই খোকার মুখের দিকে চাহিলাম; খোকা বলিল "কাকা, বড় জ্বর।" তার পরে আর খোকা কথা বলে নাই। কত আদর করিয়া

ডাকিয়াছি, কত কি বলিয়াছি, খোকা আর কথা বলে নাই। ডাক্তার আসিলেন, ঔষধ দিলেন ; বলিলেন যে, জ্বরের সঙ্গে-সঙ্গেই ঘোর বিকার ; বাক্‌রোধ হইয়াছে। তখন বুঝি দাদার জ্ঞান হইল—তখন বুঝি তিনি বুঝিতে পারিলেন, সোণার খোকাকে আর বাঁধিয়া রাখিতে পারা যাইবে না।

প্রাতঃকালেই সাহেব ডাক্তার আনা হইল, ঘণ্টায়-ঘণ্টায় ঔষধ চলিল ; কিন্তু সব বৃথা। সারাদিন গেল ; সন্ধ্যার পূর্ব্বে যখন সূর্য্যদেব পশ্চিম আকাশে ঢলিয়া পড়িলেন, তখন সেই সন্ধ্যার সময়—খোকার আমার ক্ষুদ্র প্রাণটুকু বাহির হইয়া গেল।

সেইদিনই প্রতিজ্ঞা করিলাম, আর এ পাপ পুরীতে থাকিব না—আর দাদার সঙ্গে কোন সম্বন্ধ রাখিব না। সেই রাত্রেই খোকাকে যখন শ্মশানে লইয়া গেল, তখনই আমি বাড়ী ত্যাগ করিলাম। দুই চারি দিন এদিক-ওদিক, এখানে-সেখানে কাটাইয়া এখন এই মিত্রদের বাড়ীর একটী ছেলের গৃহশিক্ষক হইয়াছি। কিছু টাকা হাতে হইলেই এ দেশ ত্যাগ করিয়া যাইব। কোথায় যাইব—ভগবান বলিতে পারেন।

জুনিয়ার উকিল

সে আজ সাত বৎসরের কথা ;—সেই বৎসরে আমি বি, এল, পাশ করি। সেই বৎসরেই আমার পূজনীয় পিতৃদেব স্বর্গারোহণ করেন। আমার বি, এল, পাশের সাত দিন পরেই তাঁহার গঙ্গাপ্রাপ্তি হয়। আমি এম্, এ, বি, এল।

বাবা কলিকাতার এক সওদাগর আফিসে সামান্য একটা চাকুরী করিয়া মাসিক বেতন যে ৬৫৲ টাকা পাইতেন, তাহাতেই আমাদের সংসার চলিয়া যাইত, আমার পড়ার ব্যয়ও নির্ব্বাহ হইত। পরিবারের মধ্যে ছিলেন আমার পিতা, মাতা, বিধবা পিসিমা, আর আমি একমাত্র সন্তান। আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে মায়ের অনুরোধে, পিসিমার তাড়নায় আরও একটী জীব আমাদের পরিবারভুক্ত হইয়াছিলেন। আমি যে বৎসর তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ি, সেই বৎসর আমার বিবাহ দেওয়া হয়। বাবার আয়-বৃদ্ধির কোনই সম্ভাবনা ছিল না ; কিন্তু ব্যয়-বৃদ্ধির বিশেষ ব্যবস্থা করিতে তিনি কিছুমাত্রই দ্বিধা বোধ করেন নাই ; কারণ তিনি মনে করিয়াছিলেন তাঁহার একমাত্র পুত্র যখন বিনা বাধায় দুইটি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে তখন বাকী কয়টিও উত্তীর্ণ হইবে, এবং অত্যল্প কালের মধ্যেই হাইকোর্ট আলো করিয়া বসিবে। এ অবস্থায় তিনি লেখাপড়া জানা উপযুক্ত পুত্রের বিবাহ দিতে সঙ্কোচ বোধ করেন নাই, —আর সঙ্কোচ বোধ করিলেও পিসিমার তাড়নায় তিনি নিতান্তই অস্থির হইয়া পড়িয়াছিলেন। পিসিমা সর্ব্বদাই বলিতেন "ননীর বৌ-এর মুখ দেখা আমার অদৃষ্টে নাই। কোন্ দিন ডাক পাড়িবে, আর চলিয়া

যাইব। কিন্তু তাঁহার আর ডাক পড়িল না। তাঁহার পূর্ব্বেই তাঁহার একমাত্র কনিষ্ঠভ্রাতা, আমার সংসারের একমাত্র অবলম্বন পিতামহাশয় স্বর্গে চলিয়া গেলেন।

বাবা যে পঁয়ষট্টি টাকা বেতন পাইতেন, তাহার দ্বারা কোন রকমে সংসার ও আমার অধ্যয়নের ব্যয় নির্ব্বাহ হইত। একটি পয়সাও তিনি সঞ্চয় করিতে পারেন নাই। তাঁহার স্বর্গারোহণের পর দেখিলাম আমার সম্পত্তির মধ্যে আছেন মা, পিসি মা ও আমার পত্নী—আর আছে কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের এক ক্ষুদ্র গলির মধ্যস্থিত একখানি অতি ক্ষুদ্র জীর্ণ আবাস—আর আছে আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচখানি প্রশংসাপত্র।

এই প্রশংসাপত্র ধুইয়া জল খাইলে যদি ক্ষুধার নিবৃত্তি হইত, তাহা হইলে আর কোন গোল ছিল না—অনায়াসে আমার ক্ষুদ্র পরিবারের ভরণপোষণ চলিয়া যাইত। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশংসাপত্র সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে কাহারও অর্থাগমের পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়াছে, এ সংবাদ ত আমি জানি না। তবে ঐ চাপরাসগুলি থাকিলে চাকুরীর বাজারে দুই চারি দিন ঘোরা ফেরা করা যায় এবং বি, এল পাশের জয়পত্র মাথায় বাঁধা থাকিলে আদালতে প্রবেশ-অধিকার পাওয়া যায়। তাহার পর অর্থ উপার্জ্জন—তাহা ষোল আনাই অদৃষ্ট-সাপেক্ষ। কত ক-অক্ষর-গোমাংস—কোম্পানীর কাগজের দ্বারা শয্যারচনা করিয়া তাহার উপর শয়ন করে, আর কত বিশ্ববিদ্যালয়ের সোনার-পদকওয়ালা ত্রিশটি টাকার জন্য বড়মানুষের অকাল-কুষ্মাণ্ড পুত্রের গৃহশিক্ষকতা এবং তাহার সঙ্গে-সঙ্গে গৃহস্বামীর মোসাহেবী করিয়াই জীবনপাত করেন।

পিতার মৃত্যুর পর আমি চারিদিক অন্ধকার দেখিলাম—ঘরে এমন একটা পয়সা নাই যাহা দ্বারা পিতার শ্রাদ্ধাদি কার্য্য সম্পন্ন করি; মাতাঠাকুরাণীর বাক্সেও এত বেশী অলঙ্কার নাই, যাহা বিক্রয় করিয়া

পিতৃকার্য্য শেষ করি এবং তাহার পরেও কিছুকাল সংসারের ব্যয় এবং আলিপুরের ট্রামভাড়া যোগাই। এম, এ, বি, এল, হইয়াছি, কুড়িটাকা বেতনের চাকুরীর জন্যও দরখাস্ত করিতে সঙ্কোচ বোধ হয়। এদিকে, গৃহে হাহাকার। মনে করিলাম, বাবা অনেককাল সওদাগরের আফিসে কাজ করিয়াছেন, সাহেবেরাও তাঁহাকে ভালবাসিতেন। একবার সেই সওদাগর সাহেবের সহিতই সাক্ষাৎ করি। অশৌচ অবস্থায়ই একদিন সেই আফিসে গেলাম। বড়সাহেব যথেষ্ট সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন; কিন্তু আমার মত একটা দিগ্‌গজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ উপাধিধারী পণ্ডিতকে তাঁহার আফিসের কোন চেয়ারেই স্থান দিবার সুবিধা দেখিলেন না। আমার ন্যায় বিদ্বান্ লোকের তাঁহার আবশ্যক নাই। বিশেষ, অল্প বেতনে আমার মনও উঠিবে না,—চলিবেও না। এই প্রকার অনেক উপদেশ বড় সাহেবের নিকট পাওয়া গেল। সেখানে কোন আশা নাই দেখিয়া আমি যখন বিদায় গ্রহণ করিবার উদ্যোগ করিলাম, বড় সাহেব তখন আমাকে একটু অপেক্ষা করিতে বলিয়া গৃহান্তরে চলিয়া গেলেন এবং কিছুক্ষণ পরেই পঞ্চাশ টাকার একখানি নোট আনিয়া আমার হাতে দিতে আসিলেন। লজ্জায়, দুঃখে ও ক্ষোভে আমি যেন মরিয়া গেলাম। অবশ্য ভিক্ষা করিতে সেখানে গিয়াছিলাম, কিন্তু এ ভাবে দান গ্রহণ করিতে আমার আত্মমর্য্যাদা নিতান্তই সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। আমি সাহেবের এই অযাচিত দান গ্রহণ করিতে পারিলাম না—সজল নয়নে অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়া সেই সওদাগরি আফিস হইতে বাহির হইলাম। সে সময়ে পঞ্চাশটী টাকা আমার নিকট বহুমূল্য,—কিন্তু কি করিব, কিছুতেই হাত পাতিতে প্রবৃত্তি হইল না।

বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া একবার ইচ্ছা হইল,—মায়ের নিকট এই ঘটনা বলি। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হইল, তাতে তাঁহাকে কষ্ট দেওয়া

ব্যতীত আর কি লাভ হইবে। সে দিনের এই ঘটনায় আমি প্রাণে বড়ই ব্যথা পাইয়াছিলাম। হায়! এতকাল পরে কি আমি সত্যসত্যই ভিক্ষুক হইলাম। সাহেবের উপর রাগ হইল না—কিন্তু আমার অদৃষ্টকে বারংবার ধিক্কার দিতে ইচ্ছা হইল। মায়ের নিকট বলিলাম না বটে, কিন্তু আমার স্ত্রীর নিকট কথাটা মোটেই গোপন করিতে পারিলাম না। আমি জানিতাম আমার সংসারানভিজ্ঞা সপ্তদশবর্ষীয়া পত্নী এ সকলের কিছুই বুঝেন না। আমার সে ভ্রম দূর হইল;—সে দিন তাঁহার নিকট হইতে যে সহানুভূতি পাইয়াছিলাম, তাহা অতুলনীয়। সেই পবিত্র প্রেমকে পাথেয় লইয়াই আজ আমি এই সংসারক্ষেত্রে জয়যুক্ত হইয়াছি। সে কথা পরে বলিব।

আমার স্ত্রী ধনীর কন্যা না হইলেও মধ্যবিত্ত গৃহস্থের দুহিতা। আমার বিবাহের সময় পিতা একটি পয়সাও গ্রহণ করেন নাই। সেই জন্য আমার বিধবা শাশুড়ী আমার স্ত্রীকে প্রায় হাজার টাকার অলঙ্কার দিয়াছিলেন। আমার স্ত্রী সেই রাত্রেই সমস্ত অলঙ্কার আমার হস্তে ধরিয়া দিলেন;—বলিলেন,"ইহা দ্বারা কর্ত্তার কাজ কর; সংসার চালাও; তুমি আলিপুরে বাহির হও। ভয় কি, ভগবান আছেন।" এই অভয় বাণী, দেববাণীর ন্যায় আমি গ্রহণ করিলাম। অলঙ্কারগুলি বিক্রয় করিতে কি কষ্ট হয় নাই?—কিন্তু দারিদ্র্যের কষ্ট ইহা অপেক্ষাও অসহনীয়। সংসারের প্রবেশপথে প্রথমেই আমার পত্নীর অলঙ্কার বিক্রয়।

(২)

পৈতৃক বসতবাটীতে আর বাস করা সম্ভব হইল না। বাড়ীটী জীর্ণ হইলেও উহার প্রত্যেক ইষ্টকখণ্ডের সহিত আমি বিশেষভাবে পরিচিত ছিলাম—প্রত্যেক বালুকাকণা আমাকে পরম স্নেহে আহ্বান করিত।

দারিদ্র্যের তাড়নায় আমি এই পৈতৃক বসতবাটী ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলাম। পঁয়ত্রিশ টাকায় বাড়ীখানি ভাড়া দিয়া বহুবাজার অঞ্চলে পনর টাকা মাসিক ভাড়ায় একখানি একতলা ছোট বাড়ী ভাড়া লইলাম,—তবুও মাসে কুড়িটী টাকার সংস্থান হইল। মা, পিসিমা কাঁদিতে লাগিলেন—অম্লানবদনে তাহা সহ্য করিলাম। কোথা হইতে এ শক্তি পাইলাম জান?—আমার পত্নীর চিরপ্রসন্ন মুখখানি আমার এই সকল মর্ম্মভেদী কঠোর কার্য্যে ক্রমাগত সহায়তা করিতে লাগিল।

আলিপুরে বাহির হই। জুনিয়ার উকিলের পক্ষে আলিপুরে বাহির হওয়ার যাহা অর্থ, তাহা অনেকেই জানেন। তবুও বিশেষ করিয়া একটু বলিয়া দিলে সাধারণ লোকে বুঝিতে পারিবে যে, ব্যাপারটি সহজ নহে। অন্ততঃ আমার ন্যায় নিঃস্ব উকিলের জন্য সেখানে কিরূপ অভ্যর্থনার আয়োজন থাকে, তাহা না প্রকাশ করিলে ঘরের খবর বলা হয় না। আমি না কি উকিলের দুর্দ্দশার চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিলাম, তাই আমার এক-একটী দিনের ঘটনা যথাযথ লিপিবদ্ধ করিলে এক একটী কাহিনী হয়।

বেলা দশটার সময় আমার পত্নী, যে দিন যাহা জুটিয়া উঠিত, তাহাই দিয়া আমাকে খাওয়াইয়া উপার্জ্জনের আশায় আমাকে বাড়ীর বাহির করিয়া দিতেন। আমি ধীরে-ধীরে বাড়ীর বাহির হইয়া ট্রামে গিয়া উঠিতাম। তাহার পর ধর্ম্মতলায় যে সকল সেয়ারের গাড়ী আলিপুরের জজকাছারী যাইবার জন্য লোক ডাকে, তাহাদের সঙ্গে একটা রফা-নিষ্পত্তি করিয়া আদালতে পৌঁছিতাম। সেখানে যাইয়া উকিলদের বসিবার জন্য যে 'বার লাইব্রেরী' নামে মুক্তিমণ্ডপ আছে, সেখানে বসিতে সাহসী হইতাম না; কারণ, সে ঘরে আমার প্রবেশের অধিকার ছিল না—আমি ত তাঁহাদের চাঁদার খাতায় প্রাবেশিক-

সেলামী পঁচিশ টাকা এবং মাসিক দুই টাকা হারে টেক্স দিতে সমর্থ হই নাই। সুতরাং আমাকে এজলাসের একধারে একখানি চেয়ার টানিয়া লইয়া সারাটি দিন কাটাইতে হইত। যখন নিতান্ত অসহ্য হইত, তখন একবার বারান্দায় এদিক-ওদিক পায়চারি করিয়া আবার গিয়া বসিতাম। এইরূপে প্রথম প্রথম দু-দশ দিন সুখে দুঃখে কাটিয়া গেল।

কিন্তু গহনা বিক্রয় করিয়া যাহা কিছু সংগ্রহ করিয়াছিলাম, তাহা নিঃশেষ হইতে বড় অধিক বিলম্ব হইল না। ক্রমে দিন যাইতে লাগিল, আর আমার স্ত্রীর সম্বল সেই গহনাগুলির বিনিময়-মূল্য শেষ হইয়া আসিতে লাগিল। প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় যখন আমি শ্রান্ত, ক্লান্ত, অবসন্ন দেহে গৃহে ফিরিতাম, আমার স্ত্রী এক বুক আশা লইয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেন—আজ কি রোজগার হইল। আমি যখন যখন বলিতাম যে, সে দিন কিছুই পাই নাই—তখন তিনি নিরাশার হাসি হাসিয়া আমাকে আশ্বাস দিয়া বলিতেন, "কাল নিশ্চয়ই কিছু পাইবে।" তাঁহার সরল হৃদয়ে এই বিশ্বাস হইত যে, ভগবান এমন দরিদ্র পরিবারের দিকে মুখ তুলিয়া চাহিবেনই চাহিবেন। আমিও সেই ভবিষ্যৎ-বাণীর উপর নির্ভর করিয়া মনে বল বাঁধিতাম; মনে হইত হয় ত দুঃখিনী মা, পিসিমার এক মুষ্টি অন্নের ব্যবস্থা ও ছিন্ন বস্ত্র মোচন করিতে পারিব।

এমনই করিয়া একটা বৎসর কাটিয়া গেল। প্রথম-প্রথম যাঁহারা বলিতেন, উকিল ডাক্তার একটু পুরাতন হইলেই তাহাদের পশার বৃদ্ধি হয়, তাঁহারা এখন সে আশ্বাসবাণীও বড় একটা দিতে পারিতেন না। আমার যাহা কিছু সম্বল ছিল, সমস্ত ফুরাইয়া আসিল;—তখন চারিদিকে অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম। যেমন করিয়া হউক আমাদের

চারিটী প্রাণীর খোরাকী খরচ ইত্যাদিতে মাসিক পঁচাত্তর টাকা পড়িত। ইহার মধ্যে কুড়িটীমাত্র টাকা পৈতৃক বাড়ী ভাড়া দিয়া পাওয়া যাইত; আর বাকী টাকা আমার স্ত্রীর সেই গহনা বিক্রয় করিয়া যোগাইতে হইত। এরূপ অবস্থায় কি করা কর্ত্তব্য বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। প্রতিদিন আদালতে বাহির হইবার সময় কত আশায় বুক বাঁধিয়া বাটীর বাহির হইতাম, আবার যখন অপরাহ্নে শুষ্ক, মলিন মুখে গৃহে প্রত্যাগমন করিতাম, তখন সংসার আমার চক্ষুর সম্মুখে ঘুরিতে থাকিত। আদালতে যাইয়া নিত্য-নিত্য এজলাসে বসিয়া অন্যান্য উকিলের সওয়াল-জবাব শুনিয়া শুনিয়া ত্যক্ত বিরক্ত হইয়া উঠিলাম। শরীরে কিঞ্চিৎ সামর্থ্য ছিল, তাই এতদিন আর সকলের ন্যায় মধ্যাহ্নে টিফিন না খাইয়াও দেহপিঞ্জরে কোন প্রকারে প্রাণ রক্ষা করিয়া আসিতেছিলাম। কিন্তু বহুদিনের অত্যাচারে, অনিয়মে ও অনাহারে শরীর ভগ্ন হইয়া আসিল। ইহার উপর আবার সর্ব্বগ্রাসী চিন্তা অহোরাত্র আমার হৃৎপিণ্ডের উপর আসন বিছাইয়া বসিয়াছিল।

দুরন্ত গ্রীষ্মে এক এক দিন জলপিপাসায় বুকের ছাতি ফাটিয়া যাইত; তখন একটু জলপান করিবার জন্য ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিয়াও কোন সুবিধা করিতে পারিতাম না। অথচ আলিপুরের জজ আদালতের একজন এম, এ, বি, এল, উকিল চোগা চাপকান শামলা লইয়া আদালত-প্রাঙ্গণের পুষ্করিণীতে অঞ্জলি করিয়াও জল খাইতে পারি না। পান-তামাকের দোকানে শুধু জল খাইতে দেয় না, সেখানে পয়সা খরচ করিলে তবে দাবি চলে। দুই একদিন পরিচিত দুই একজন উকিলের সঙ্গে তাঁহাদের সেরেস্তায় গিয়া জল খাইয়া আসিলাম; কিন্তু পরে লজ্জায়, ঘৃণায় তাহাও অসহ্য হইয়া উঠিল। দরিদ্র আমি—

ভাবিয়া আর উপায় স্থির করিতে পারিতাম না। পিপাসার তাড়নায় একদিন অস্থির হইয়া কোন সুযোগ করিতে পারিলাম না—এদিকে তৃষ্ণায় কণ্ঠতালু শুকাইয়া গিয়াছে। আর হিতাহিত বিবেচনা না করিয়াই—পুষ্করিণীতে নামিয়া অঞ্জলিপুটে জলপান করিলাম। জীবন ত রক্ষা পাইল, কিন্তু এমন করিয়া আর কত দিন চলে।

প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যয়ন করিবার সময় যাহারা আমার নিকট অনেক সময় পাঠ লইত, তাহারাও বেশ গাড়ী-ঘোড়া চড়িয়া উকিল-গিরি করিতেছে। তবে কোন্ গ্রহের ফলে আমি, সুবর্ণ-পদক-প্রাপ্ত উকিল, শ্রীনলিনীরঞ্জন মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল ছিন্ন চাপকান চোগা পরিয়া দীনহীন কাঙ্গালের ন্যায় প্রতিদিন আদালত হইতে নিরাশ হৃদয়ে বাটী ফিরিতাম। বর্ষাকালে দুঃখের মাত্রা আরও একটু বৃদ্ধি হইল। বেলা ১০টার সময় যদি ইন্দ্রদেবের মরজি হইত—আর দুই বিন্দু জল পড়িত, অমনি ধর্ম্মতলায় রথচালকগণ দুই আনার স্থানে একদম্ বার আনা হাঁকিয়া বসিত। চোগা চাপকানে ভূষিত এই উকিল মহাশয় তখন চারিদিক অন্ধকার দেখিয়া কালীঘাটের ট্রামে উঠিয়া বেলতলায় নামিয়া পদব্রজেই আলিপুরে যাতায়াত করিতেন। প্রতিদিন যাই আসি; কেহ জিজ্ঞাসাও করে না—"তুমি বাবু রোজ রোজ ধড়াচূড়া পরিয়া যথাসময়ে আলিপুরের বটতলায় হাজিরা দেও কেন?" মানুষের সহিষ্ণুতার সীমা আছে—জুনিয়ার উকিলেরও আছে। তিন তিনটী বৎসর মাথার উপর দিয়া চলিয়া গেল,—কত কষ্ট কত অভাবের মধ্য দিয়া দিন কাটাইলাম, তাহা ভগবান্ জানেন। কত বিনিদ্র-রজনী চিন্তায় কাটিয়া গেল—তবুও অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইল না—তবুও আলিপুরে কেহ আমাকে চিনিল না—কোন মক্কেল একটা মোকদ্দমাও দিল না—আমার যাতায়াতই সার;

হইতে লাগিল। ঘরে লোহার সিন্দুক-ভরা কোম্পানীর কাগজ থাকিত—যথাসময়ে বেঙ্গল ব্যাঙ্ক সুদের টাকা যোগাইত, তাহা হইলে এই সুখের ওকালতী পোষাইত—অনেকেরই পোষাইয়া থাকে। কিন্তু যাহাকে পরিবারের অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া সংসার চালাইতে হয়—ট্রামভাড়া দিতে হয়, তাহার আর চলে না। বসিয়া খাইলে রাজার ভাণ্ডার ফুরাইয়া যায়—আমার স্ত্রীর অলঙ্কার বিক্রয়ের টাকা আর কয়টা। তিন বৎসরে সব শেষ হইয়া গেল। ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার মূর্ত্তিমতী দেবী আমার পত্নী এতদিনও আশায় বুক বাঁধিয়া ছিলেন; আমাকে প্রত্যহ ভরসা দিতেন;—প্রতিদিনই বলিতেন, এমন দিন থাকিবে না। কিন্তু ক্রমে তাঁহার মুখেও কালিমার সঞ্চার হইল—তিনিও এই সংসার-সংগ্রামে অবসন্ন হইয়া পড়িতে লাগিলেন। আমি সকলই বুঝিতে পারিলাম।—এতদিনও মাথা তুলিয়া বেড়াইয়াছি, এইবার আমার পরাজয়—এইবার আমাকে কি করিতে হইবে, তাহা আমিই ভাবিয়া পাই নাই। আমার সহিষ্ণুতা সীমা অতিক্রম করিয়াছিল—আর দিন চলে না—আর আলিপুরের দিকে যাইতে ইচ্ছা করে না।

একদিন আলিপুর হইতে ফিরিয়া আসিয়া মনে বড়ই ধিক্কার জন্মিল। একবার মনে হইল দেশত্যাগ করিয়া চলিয়া যাই; কিন্তু তারপর, যাঁহারা আমার মুখের দিকে চাহিয়া আছেন, তাঁহাদের অদৃষ্টে কি হইবে। পলায়ন করিতে পারিব না;—মরিতে হয়—মা, পিসিমা ও আমার স্ত্রীকে লইয়া ঘরের মেঝে কামড়াইয়া অনাহারে মরিব।

সন্ধ্যার সময় বাক্স খুলিয়া আমার জীবনের অবলম্বন,—যৌবনের সখা, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশংসাপত্রগুলি বাহির করিলাম। সেগুলি

পকেটে করিয়া একেবারে বরাবর গঙ্গাতীরে গেলাম। সন্ধ্যার পরে সেই নির্জ্জন গঙ্গাতীরে বসিয়া কিছুক্ষণ ভাবিলাম—কি ভাবিলাম তাহা কি আজ এই চারি বৎসর পরে মনে আছে?

অনেক ভাবনা-চিন্তার পর আমার বড় সাধের ডিপ্লোমাগুলি খণ্ড খণ্ড করিয়া গঙ্গায় নিক্ষেপ করিতে লাগিলাম। তখন জোর ভাটা;—সেই ছিন্ন কাগজখণ্ডগুলি নাচিতে নাচিতে সাগরসঙ্গমে চলিয়া গেল—তাহাদের হাড়ে বাতাস লাগিল।

তাহার পর বাড়ী আসিলাম। আমার স্ত্রীকে সমস্ত কথা খুলিয়া বলিলাম! তিনি অনেকক্ষণ বসিয়া বসিয়া ভাবিলেন; তাহার পর ঘরের একপার্শ্বে একটি ছোট বাক্স ছিল—তাহা খুলিয়া একজোড়া সোণার বালা বাহির করিয়া আনিলেন—ইহাই আমার স্ত্রীর শেষ সম্বল। বালা দু-গাছি আনিয়া তিনি বলিলেন—"আর ওকালতী নহে। তিন বৎসর একজন মানুষের অদৃষ্ট-পরীক্ষার জন্য যথেষ্ট। আমি একটা কাজ বলি—পারবে?" আমি বলিলাম "পারিব—মনু, এখন আমি সব পারিব।" তিনি বলিলেন—"আর ওকালতীতে কাজ নাই, আর পরের চাকুরীতেও কাজ নাই; একখানি চা'লডালের দোকান কর। পারিবে?" আমি বলিলাম, "সব পারিব, আর আমার অহঙ্কার নাই, অহঙ্কারের দলিল-পত্র গঙ্গায় ভাসাইয়া দিয়াছি।" "তবে এই লও তোমার মূলধন" এই বলিয়া তিনি বালা দুগাছি আমার হাতে দিলেন। মনুর অনেক অলঙ্কার হাত পাতিয়া লইয়াছি, আর তাহার দ্বারা পোড়া উদরের সেবা করিয়াছি—আমার লজ্জা ছিল না। স্ত্রীর শেষ সম্বল লইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ উপাধিধারী আমি শ্রীনলিনীরঞ্জন মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল, স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত, মুদীখানার দোকান খুলিলাম। তোমরা একবার বল বন্দে মাতরম্।

(৪)

তাহার পর এই চারি বৎসর যায়। আর আমি আলিপুরের জুনিয়ার উকিল নহি; আর আমি এখন পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ হইয়া আলিপুরের আদালতের পুকুরে অঞ্জলি করিয়া জল খাই না;—আর আমি ক্ষুধার জ্বালায় ছট্‌ফট্‌ করি না। তোমাদের আশীর্ব্বাদে আমি আমার পৈতৃক জীর্ণ বাড়ী সংস্কার করিয়াছি এবং সেখানেই এখন বাস করি। আমার মুদিখানার দোকান এখন আর মুদিখানা নহে—তাহা এখন আড়ত হইয়াছে। আমার ব্যবসায় বাড়িয়া গিয়াছে। আর অতি শুভক্ষণে গত পূর্ব্ব বৎসরে বন্দে মাতরম্‌ মন্ত্র দেশে আসিয়াছিল। ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিয়াছে। আমার মত এম, এ, বি, এল, মহাশয়েরা এখন আর আমাকে বোকা বলেন না—আমার বুদ্ধির তারিফ করেন। এখন অনেকেই জুনিয়ারি ছাড়িয়া অন্যদিকে যাইতেছেন; যাঁহার সাহস আছে তিনি আমার মত মুদির দোকান আরম্ভ করিয়াছেন, কেহ চাষবাস করিতেছেন। আজ কলিকাতায় কত স্বদেশী দোকানদার—অনেকেই আমার মত জুনিয়ার উকিল—আমারই মত বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, এ, বি, এল।

সংসারের অন্নকষ্ট ঘুচিয়াছে। গৃহিণীর কোলে একটী স্বর্গের শিশু আসিয়াছে। অলঙ্কারের কথা বলিলেই তিনি খোকাকে দেখাইয়া বলেন "এই আমার অলঙ্কার"—আর যাহা বলেন সে কবিত্ব আর আড়তদারের মুখে শোভা পায় না। আমি ত আর এখন "নলিন বাবু" নহি—আমি যে "মুখুয্যে মশাই।" তোমার বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল চিহ্ন মুছিয়া ফেলিয়াছি;—এখন আর তোমার ফিজিক্স, কেমিষ্ট্রী, তোমার মিল বেন্থাম আমার কাজে লাগে না—এখন আমি স্বহস্তে জমাখরচ লিখি, খতিয়ান লিখি—টাকার তাগাদা

করি; আর দোকানে যদি কখন অবকাশ পাই তখন "কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান্" পাঠ করি। বাড়ীতে গিন্না খোকাকে শিখাই—"বল বাবা, 'বন্দে মাতরম্'।" খোকা আধ-আধস্বরে বলে "বাবা বাঁধ মারো"। আমি তাহার এই বাণী শুনিয়া বলি, "খোকা, আর বিপিন পালের ভয় নাই; তোমার মত মহারথীই তাঁর দরকার।" খোকা আমার এই 'কম্প্লিমেণ্টে' খুসী হইয়া পৃথিবীর মধ্যে তাহার নির্ভয় দুর্গ জননীর কোলে মুখ লুকায়, আর আমি ক্ষণকালের জন্য দিব্যচক্ষে দেখি আমার সম্মুখে "গণেশ-জননী"।

কালো মেয়ে

(১)

রামকানাই বসু রাইপুরের একজন সম্পন্ন গৃহস্থ। জমাজমি যাহা আছে, তাহার আয়ে সংসার চলিয়া যায়, বৎসরান্তে কালীপূজার খরচও জমির আয় হইতেই চলে। তাহা ছাড়া বসুজার লম্বী কারবারও আছে, তাহাতেও বিলক্ষণ দশটাকা আয়; সুতরাং গ্রামের মধ্যে বসুমহাশয়েরা দশজনের একজন।

রামকানাই বসু ইংরাজী লেখাপড়া জানেন না; অল্প বয়সে সামান্ত কিতাবতি লেখাপড়া শেষ করিয়াই হরিপুরের বাবুদের জমিদারী-সরকারে প্রথম তিনি তহশীলদার হ'ন, ক্রমে ক্রমে প্রমোশন পাইয়া নবাবগঞ্জ পরগণার নায়েব পর্য্যন্তও হ'ন। শেষ বয়সে আর চাকুরী ভাল না লাগায়, বসু মহাশয় কর্ম্মত্যাগ করিয়া দেশে আসিয়া বসেন।

সংসারে স্ত্রী ও একটী পুত্র ব্যতীত রামকানাইয়ের আর কেহ ছিল না। নায়েবী করিয়া যাহা সংস্থান করিয়াছিলেন, তাহাতে সংসার বেশই চলিত।

ছেলের নাম হরিপদ। রামকানাই নিজে ভাল লেখাপড়া জানিতেন না; এজন্ত প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, যথাসর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়াও ছেলেটিকে মানুষ করিবেন।

যথাসর্ব্বস্ব ব্যয় করিলেই যদি ছেলে মানুষ হইত, তাহা হইলে অনেক বড়মানুষের ছেলে এতদিনে মানুষ হইয়া যাইত। হরিপদর শিক্ষার জন্

রামকানাই যথাসর্ব্বস্ব না হউক, যথেষ্ট ব্যয় করিয়াছিলেন; কিন্তু নবাবগঞ্জ স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীর সহিত হরিপদর এমন মিত্রতা হইয়াছিল যে, সে চারি বৎসরেও সে শ্রেণীর উপরে যাইতে পারিল না—চারি বৎসর পরে বোধ হয়, মনোমালিন্য হওয়ায় হরিপদ বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণী হইতে একেবারে রাজপথে আসিয়া দাঁড়াইল।

হরিপদ যে কোন বিদ্যাই শিখে নাই, তাহা বলিতে পারি না। আঠার বৎসর বয়স পর্য্যন্ত মা সরস্বতীর আরাধনা করিয়া সে ঐ নিষ্ঠুরা দেবীর প্রসাদলাভে যদিও বঞ্চিত হইয়াছিল, কিন্তু দেবীরও পূজনীয় কৈলাসনাথের অনুচরগণের মধ্যে স্থানলাভ করিবার উপযুক্ত শিক্ষা সে পাইয়াছিল। প্রথমে হরিপদ সিদ্ধির ক্লাশে ভর্ত্তি হইল, (তখন সিগারেট দেশে চলে নাই) তিন মাস যাইতে না যাইতেই সে গাঁজার ক্লাসে প্রমোশন পাইল। তাহার পর দুই বৎসরের মধ্যেই সে সরকারী আবগারী বিভাগের একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক হইয়া উঠিল। এ অবস্থায় নবাবগঞ্জ উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণীর সহিত তাহার মিত্রতা যে দূর হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই।

বাপমায়ের একমাত্র ছেলে, সুতরাং বাপ-মা প্রথম যখন হরিপদর শিক্ষানবিশীর অবস্থা জানিতে পারিলেন, তখন সে দিকে তেমন মনোযোগ করিলেন না;—ছেলেমানুষ বলিয়াই উড়াইয়া দিলেন। বয়স হইলেই সব দোষ দূর হইবে! কিন্তু বয়স বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে হরিপদের শিক্ষাও বাড়িতে লাগিল। শেষে যখন রামকানাই পুত্রকে শাসন করিতে গেলেন, তখন পুত্র হাতের বাহির হইয়া গিয়াছে। বিশেষতঃ রামকানাইয়ের গৃহিণী যখন পুত্রের উপর পিতার তাড়না দেখিয়া অশ্রুবর্ষণ আরম্ভ করিতেন, তখন বেচারী রামকানাই একেবারে এতটুকু হইয়া যাইতেন। "আমার ঐ একই ছেলে, কত টাকাই উড়াবে" বলিয়া গৃহিণী

যখন মনকে প্রবোধ দিতেন, নবাবগঞ্জের জমিদারের নায়েব মহাশয় আর দ্বিরুক্তি করিতে পারিতেন না। মনের দুঃখে নায়েব মহাশয় ছেলেকে স্কুল ছাড়াইয়া দেশে আসিলেন।

(২)

হরিপদর এখন বড়ই অসুবিধা। রাইগঞ্জ তেমন একটা সহর নহে, সামান্য গ্রাম। সে গ্রামে সভ্যতার গৌরব-বাহিনী মদের দোকান স্থাপিত হইবার কোনই সুবিধা হয় নাই। ছোট বাজার—সেখানে একখানি গাঁজা ও আফিমের দোকান ছাড়া দেশী বা বিলাতি মদের দোকান ছিল না; কাজেই শ্রীমান্ হরিপদ মদ ছাড়িয়া দিল; কিন্তু ক্ষতিপূরণ স্বরূপ সে গাঁজার মাত্রাটা বাড়াইয়া দিল এবং আফিমের একটা বিশুদ্ধ সংস্করণও গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিল। হরির মা ইহাতে আনন্দিত হইলেন। কর্ত্তাকে বলিলেন, "দেখেছ, ছেলে আমার ভাল হইয়াছে; মদের নেশা একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছে। এখন ছেলের একটা বিবাহ দাও; তাহা হইলে সামান্য যে একটু তামাক খাওয়া অভ্যাস আছে, তাহাও থাকিবে না।"

রামকানাই গৃহিণীর বাক্য চিরদিনই বেদবাক্যের ন্যায় বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার বিশ্বাস, স্ত্রীর ভাগ্যেই তাঁহার অবস্থা স্বচ্ছল হইয়াছে। এ হেন লক্ষ্মীস্বরূপিণী গৃহিণীর কোন আদেশ অবহেলা করা, হেলায় লক্ষ্মী হারাইবার মতই তিনি মনে করিতেন।

হরিপদর বিবাহের সম্বন্ধ আসিতে লাগিল; কিন্তু যে সকল মেয়ের বাপের সামান্য একটু কাণ্ডজ্ঞান আছে, তাঁহারা কেহই রামকানাইয়ের জোতজমা দেখিয়া ভুলিলেন না—ছেলের অতুলনীয় গুণরাশি দেখিয়াই তাঁহারা পৃষ্ঠভঙ্গ দিলেন। অবশেষে কানাইনগরের পশুপতি মিত্রের

কন্যার সহিত হরিপদর বিবাহ স্থির হইয়া গেল। পশুপতির অবস্থা বড়ই শোচনীয়; তিন চারিটী মেয়ে পার করিতে হইবে। ছেলের অত শত খুঁত দেখিলে কি তাঁহার চলে। বিশেষতঃ তাঁহার মেয়েগুলির শরীরের রংয়ের সহিত মসীর রংয়ের কোন বিশেষ পার্থক্য ছিল না; আজকালকার ছেলেরা কি সহজে এমন মেয়ে গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়। এই রকম সাত-পাঁচ ভাবিয়াই পশুপতি বিবাহ দিতে সম্মত হইলেন। রামকানাই টাকাকড়ির জন্য বিশেষ আগ্রহ করিলেন না;—গৃহিণীর নিষেধ।

হাল ফেসানের ছেলে হইলেও হরিপদ স্বয়ং ক'নে দেখিতে গেল না—তাহার বিবাহে মোটেই মত ছিল না। অগত্যা যে কাজ করিতে হইতেছে, তাহাতে আর দেখা-শুনা কেন? যথাসময়ে হরিপদর সহিত পশুপতির মেয়ে উমাকালীর বিবাহ হইয়া গেল! প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ!

(৩)

বউ ঘরে আসিল, কিন্তু হরিপদ ঘরে আসিল না। বধূর মসীবিনিন্দিত রং দেখিয়াই তাহার মন চটিয়া গেল। বাপ-মা যাহা মনে করিয়া তাড়াতাড়ি হরিপদর বিবাহ দিলেন, তাহার কিছুই হইল না; লাভের মধ্যে হরিপদ বাড়ীতে রাত্রিবাস ত্যাগ করিল। নিশাযাপনের জন্য সে অন্য ব্যবস্থা করিয়া লইল।

রামকানাই এবং তস্য গৃহিণী ইহাতে বড়ই চটিয়া গেলেন; কিন্তু সে চোটটা যেখানে প্রযুক্ত হওয়া উচিত ছিল, সেখানে না পড়িয়া নিরপরাধা এক বেচারীর উপর গিয়া পড়িল। তাঁহাদের যত রাগ সব ঐ অলক্ষুণে বউটীর উপর পড়িল। পশুপতির কন্যা নিতান্ত নাবালিকা ছিল না—উমাকালীর বয়স যখন কোষ্ঠীতে পনর বৎসর, তখনই পশুপতি তাহাকে

'এই সবে বারতে পা দিয়াছে' বলিয়া পার করিয়াছিল। স্বামী কি পদার্থ তাহা উমাকালী বুঝিতে পারিয়াছিল। স্বামীর অনাদর ও অবজ্ঞা তাহার প্রাণে বড়ই বাজিতে লাগিল। তাহার পর শ্বশুর-শাশুড়ী যখন গঞ্জনা দিতে আরম্ভ করিলেন, তখন সে বুঝিতে পারিল না—তাহার কি অপরাধ। তাহার চেহারা ভাল নহে; কিন্তু সে জন্য ত সে দায়ী নহে। কে যে দায়ী, তাহাও সে ভাবিয়া পাইল না। তাহার পিতা যে কোন প্রকার প্রতারণা করিয়া তাহার মত কালো মেয়ে পার করিয়াছেন, তাহাও সে বুঝিতে পারিল না। সে শুধু দেখে সকলেই তাকে তুচ্ছ করে। শাশুড়ী তাহাকে সকলের সমক্ষেই অলক্ষুণে বলিয়া গালি দেয়। সত্য সত্যই কি সে অলক্ষুণে! কিসে তাহার লক্ষণের অভাব হইল, অনেক চিন্তা করিয়াও তাহা সে আবিষ্কার করিতে পারিল না।

উমাকালী বুঝিল, চিরজীবন এই প্রকার দুঃখের বোঝা বহিয়াই তাহাকে জীবনযাপন করিতে হইবে। ইহা হইতেও অধিকতর দুঃখ যে তাহাকে ভোগ করিতে হইবে, তাহা সে কখন মনেও ভাবিতে পারে নাই।

(৪)

একদিন কর্ত্তা-গিন্নীতে মহা বিবাদ উপস্থিত। বিবাদ বলিলে বোধ হয় কথাটা ঠিক বলা হয় না; কারণ বিবাদে দুই পক্ষই কথা বলে। উপস্থিত ক্ষেত্রে একপক্ষ নীরব, ধীর, অতি সহিষ্ণু শ্রোতা; অপর পক্ষ বক্তা। গৃহিণী বক্তার আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। গৃহিণীর প্রধান অভিযোগ কর্ত্তা চক্ষুহীন ব্যক্তি; তিনি অনেক দিন হইতেই মানুষের পরম ধন চক্ষু দুইটির মস্তক চর্ব্বণ করিয়াছেন; নতুবা তিনি কেমন করিয়া দেখিয়া শুনিয়া এমন কালো ভূত, অলক্ষুণে মেয়ের সঙ্গে তাঁহার সোনারচাঁদ

হরিপদর সম্বন্ধ করিলেন। রামকানাই এ ক্ষেত্রে জবাব দিবার কিছুই খুঁজিয়া পাইলেন না; সুতরাং গৃহিণীর বাক্যসুধা নীরবে পরিপাক করা ব্যতীত তাঁহার উপায়ান্তর ছিল না।

প্রচুর বাক্যসুধা বর্ষণের পর গৃহিণী প্রস্তাব করিলেন যে, যাহা হইবার হইয়াছে, এখন এ বৌটাকে বাপের বাড়ী চিরদিনের মত পাঠাইয়া দেওয়া হউক। তিনি ভাল একটী মেয়ে দেখিয়া সোনারচাঁদের আবার বিবাহ দিন; তাহা হইলেই সমস্ত গোল মিটিয়া যাইবে। রামকানাই এ প্রস্তাবে সম্মত না হইয়া কি করেন।

এমন কথাটা গোপনে থাকিবার নহে; বিশেষতঃ কর্ত্তা-গৃহিণীও ইহা গোপন করিবার কোন আবশ্যকতা দেখিলেন না। কথাটা উমাকালীরও কর্ণে পৌছিল। সে এতদিন মনে করিয়াছিল, স্বামী শ্বশুর শাশুড়ী যাহাই করুন, বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিতে কিছুতেই পারিবেন না। গৃহের সকলের স্নেহে বঞ্চিত হইয়াও সে আশা করিয়াছিল, এক মুষ্টি অন্নে বঞ্চিত হইবে না। তাহার পিতা অতি দরিদ্র ব্যক্তি, তাঁহার উপর বোঝা হইতে যাওয়া তাহার পক্ষে অকর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হইল।

একবার উমাকালী মনে করিল, স্বামীর পায়ে ধরিয়া নিষেধ করিবে। স্বামী একটা কেন দশটা বিবাহ করুন, কিন্তু এ বাড়ীতে দাসীবৃত্তি করিবার অধিকার তাহাকে প্রদান করা হউক। কথাটা মনে হইল বটে, কিন্তু দ্বিতীয়বার আর সে কথাটা ভাবিতে পারিল না। তাহার স্বামী তাহাকে ত্যাগ করিবে, অন্য পত্নী গ্রহণ করিবে, একথা মনে করিতেও তাহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল! সে ভাবিল, এই অল্পবয়সেই ভগবান্ তাহাকে এত কষ্ট দিতেছেন কেন? সে কি অপরাধ করিয়াছে? সমস্ত রাত্রি উমাকালী এই সকল কথাই ভাবিতে লাগিল। ভাবিতে ভাবিতে কখন তাহার নিদ্রাকর্ষণ হইয়াছিল, তাহাও সে জানিতে পারে নাই।

(৫)

উমাকালী যে ঘরে ঘুমাইতেছিল, সে ঘরে আর কেহ ছিল না। সে একলা ভিজা মাটিতে পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল।

এদিকে হরিপদ সে রাত্রে একটু অধিক পরিমাণে গঞ্জিকা সেবন করিয়া অপ্রকৃতিস্থ হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার রাত্রিবাসের স্থানে নানাপ্রকার উপদ্রব করায় গৃহস্বামিনী তাহাকে বাড়ী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিল।

হাজার হউক ভদ্রলোকের ছেলে। এইভাবে অবমানিত ও গৃহবহিষ্কৃত হওয়ায় তাহার গাঁজার নেশা যেন ছুটিয়া গেল। সে অন্যমনস্কভাবে শেষরাত্রে বাড়ীর দিকে আসিতে লাগিল। মনটা যেন আজ কেমন করিতে লাগিল।

ধীরে ধীরে বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া দেখে, সকল ঘরের দ্বারই ভিতর হইতে বন্ধ, কেবলমাত্র একখানি ঘরের দ্বার বন্ধ করিতে কে যেন ভুলিয়া গিয়াছিল। হরিপদ মনে করিল, এই ঘরে গিয়াই অবশিষ্ট রাত্রিটুকু কাটাইবে।

ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখে, একপার্শ্বে একটি প্রদীপ মৃদু মৃদু জ্বলিতেছে। খাটের উপর বিছানায় কেহই নাই। সে যখন সেই বিছানায় শয়ন করিতে যাইবে, তখন দেখে ভূমিশয্যায় উমাকালী শয়ন করিয়া আছে; তাহার কেশপাশ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

হরিপদ হঠাৎ চমকিয়া দাঁড়াইল। এতদিন পরে একবার সেই কালো, অনাদৃতা, উপেক্ষিতা, অলক্ষুণে মেয়েটার মুখের দিকে সে চাহিয়া দেখিল। দৃষ্টি আর ফিরাইতে পারিল না। গাঁজাখোর হরিপদ সেই কালো মুখখানিতে যেন স্বর্গের অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ দেখিল। ছেলেবেলায়

সে পূজা দেখিতে গেলে, লক্ষ্মীর মুখে যে শোভা দেখিত, আজ তাহার অবমানিতা পত্নীর মুখে সেই শোভা দেখিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, ঐ কালোরূপে যেন ঘরখানি আলো হইয়া আছে; তাহার মনে হইল, ঐ কালোরূপ যেন স্বর্গের অমৃত চারিদিকে বর্ষণ করিতেছে; —তাহার মনে হইল—এমন সুন্দর মুখ—এমন পবিত্র দৃশ্য—এমন স্বর্গীয় মাধুরীমাখা শ্রী সে কখন দেখে নাই। এত রূপ, এত পবিত্রতা যে মানুষের থাকিতে পারে, তাহা সে জানিত না।

হরিপদ আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না—সে সেই স্থানেই বসিয়া পড়িল; এক একবার উমাকালীর মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করে, আর তাহার প্রাণ যেন শীতল হইয়া যায়। তাহার মনে হইতে লাগিল, কি এক আশ্চর্য্য অমানুষিক শক্তির প্রভাবে তাহার মনের সমস্ত মলিনতা যেন কাটিয়া যাইতেছে, তাহার সমস্ত নেশা যেন ছুটিয়া যাইতেছে। সে এতদিন যে জগতে বাস করিতেছিল, কে যেন তাহাকে সে জগৎ হইতে তুলিয়া আর কোথায় লইয়া যাইতেছে। অলক্ষ্যে তাহার চক্ষু হইতে দুই বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। তাহার বিগত জীবনের কার্য্য-সকল মনে হইয়া, তাহার হৃদয় যেন ফাটিয়া যাইতে লাগিল।

তাহার পর কি অন্যায় কার্য্যেই সে সম্মতি প্রদান করিয়াছিল! ঘরে যাহার এমন দেবী-প্রতিমা বিদ্যমান, সে কি না তাহাকে ছাড়িয়া আবার বিবাহ করিতে যাইতেছিল। হরিপদ অনুতাপের তীব্রদংশনে জর্জ্জরিত হইতে লাগিল—কি করিবে তাহা ভাবিয়া পাইল না।

এমন সময় উমাকালী ঘুমের ঘোরে কাঁদিয়া উঠিল, জোড়হস্তে বলিল—"ওগো আমাকে তাড়াইয়া দিও না।"

হরিপদ আর স্থির থাকিতে পারিল না, পাষাণ গলিতে আর

হইয়াছিল, এবারে আর বাধা মানিল না। সে পাগলের মত উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল, "না উমা, কে তোমাকে তাড়ায়?"

মানুষের গলার শব্দ শুনিয়াই ভীতা হইয়া উমাকালী ব্যস্তভাবে উঠিয়া বসিল; চাহিয়া দেখে তাহার শিয়রে তাহার জীবনের দেবতা,—তাহার সাধনার ধন, তাহার যথাসর্ব্বস্ব হরিপদ বসিয়া আছে। তাহার মুখে আর কথা সরিল না; সে মনে করিল, তখনও বুঝি সে স্বপ্ন দেখিতেছে। তাই সে আবার কাতরকণ্ঠে বলিল, "ঠাকুর, আমার এ স্বপন ভাঙ্গিও না।"

হরিপদ তখন অনাদৃতা দুঃখিনী পত্নীকে কোলে জড়াইয়া ধরিল; বলিল "না উমা, এ স্বপ্ন নহে। সত্যসত্যই আমি আসিয়াছি। আর তোমাকে ছাড়িয়া থাকিব না। তোমার মুখ দেখিয়া আমার নূতন জীবন লাভ হইল।" উমাকালী আর কিছুই বলিতে পারিল না—তাহার চক্ষুর সম্মুখে সমস্ত পৃথিবী ঘুরিতে লাগিল।

প্রত্যুষের আর বিলম্ব ছিল না; গাছে গাছে পাখী গান করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, পূর্ব্বের দিকে ঈষৎ আলোকের রেখা দেখা দিয়াছিল। সেই শুভমুহূর্ত্তে এই দুঃখতাপক্লিষ্ট সংসারের একটী ক্ষুদ্র গৃহে স্বর্গের পবিত্র কিরণ নামিয়া আসিয়াছিল।

এমন সময়ে গ্রামের জগা পাগলা সেই রাস্তা দিয়া গাহিতে গাহিতে যাইতেছিল,—

"তাই কালো-রূপ ভালবাসি।
শ্যামা মনোমোহিনী এলোকেশী।"

মেয়ে লাথি

রাণীগঞ্জ হইতে বাঁকুড়া যাইবার একটি রাজপথ আছে ; কিন্তু এই রেল-বিস্তারের দিনে কিছুদিন পরে ঐ পথের বর্ত্তমান অবস্থা আর থাকিবে না। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে অনেক দিনের কথা নহে। বার বৎসর পূর্ব্বে রাণীগঞ্জ হইতে দশ বার মাইল দূরে বাঁকুড়ার পথে একখানি গ্রাম ছিল—ছিল কি, গ্রামখানি এখনও আছে। চারিদিকে বড় বড় শালের গাছ, তাহারই মধ্যে কয়েকখানি অতি ক্ষুদ্র জীর্ণ কুটীর। বাঁকুড়ার রাস্তা হইতে এই গ্রামখানি এখনও দেখা যায়। আমরা এই গ্রামের প্রকৃত নাম গোপন করিয়া তাহাকে পলাশপুর নামেই পরিচিত করিব।

এই ক্ষুদ্র পলাশপুর গ্রামে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ প্রভৃতি কোন শ্রেণী হিন্দুরই বাস ছিল না—এখনও নাই। গ্রামে অল্প যে কয়েকখানি ক্ষুদ্র কুটীর আছে, তাহার সকলগুলিতেই সাঁওতালের বাস—পলাশপুর একখানি অতি ক্ষুদ্র সাঁওতাল পল্লী।

এই সাঁওতাল পল্লীতে একখানি অতি জীর্ণ কুটীরে একজন সাঁওতাল যুবক সপরিবারে বাস করিত। সপরিবার বলিলাম বটে, কিন্তু পরিবারের মধ্যে সাঁওতাল যুবকের এক যুবতী স্ত্রী ব্যতীত আর তৃতীয় ব্যক্তি ছিল না। যুবকের নাম মতিয়া—তাহার স্ত্রীর নাম ভৈরী। সেই নির্জ্জন গ্রামে এই যুবক যুবতী সুখে দুঃখে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিত। যুবকের কিঞ্চিৎ জমি ছিল ; সেই জমিই তাহাদের ভরণপোষণের এক মাত্র অবলম্বন। স্বামী-স্ত্রীতে সেই জমি চাষ করিত এবং তাহা হইতে যে শস্য

উৎপন্ন হইত, তাহা দ্বারাই এই দুইটি মানুষের কোন প্রকারে দিনপাত হইত।

আমাদের দেশে অন্নকষ্টটা দরিদ্রের চিরসহচর হইয়া পড়িয়াছে। ১৩০১ সালে যথাসময়ে বৃষ্টি হইল না, প্রখর রৌদ্রের তাপে মাঠের শস্য মাঠেই পুড়িয়া গেল। সাঁওতাল কৃষকেরা প্রতিদিন আকাশের দিকে চাহিয়া থাকিত—বৃষ্টি আর হয় না। শস্য সমস্ত পুড়িয়া গেল,—দরিদ্র কৃষকেরা মাথায় হাত দিয়া বসিল—বুঝিল, ভগবান্ এবার তাহাদের অদৃষ্টে অনাহারে মৃত্যু লিখিয়াছেন।

মতিয়া ও ভৈরীর যে সামান্য জমি ছিল, তাহাতে শস্য জন্মিল না,—মতিয়া দূর গ্রামের মাড়োয়ারী মহাজনের নিকট টাকায় দুই আনা সুদে টাকা ধার করিতে গেল। সে গ্রাসাচ্ছাদনের একমাত্র উপায় সামান্য কয়েক বিঘা জমি বন্ধক দিতে প্রস্তুত। নিষ্ঠুর মহাজন তাহাকে এক পয়সাও ধার দিতে স্বীকার করিল না। মতিয়া বিষণ্নমনে ভগ্নহৃদয়ে ঘরে ফিরিয়া আসিল। তাহার মলিন মুখ দেখিয়াই ভৈরী বুঝিতে পারিল টাকা পাওয়া যায় নাই। সে মতিয়াকে অনেক বৃথা ভরসা দিল, কিন্তু শুধু মুখের ভরসায় ত ক্ষুন্নিবৃত্তি হয় না। মতিয়া দেখিল—অনাহারে মৃত্যু নিশ্চিত। তখন সে বুঝিল, পলাশপুরের এই ক্ষুদ্র কুটীরের মায়ায় আবদ্ধ থাকিলে, প্রাঙ্গণের প্রকাণ্ডকায় শাল বৃক্ষের শীতল ছায়ার প্রলোভন কাটাইতে না পারিলে এই কুটীরে পড়িয়াই অনাহারে মরিতে হইবে। গ্রামের সকলেরই এক দশা—কে কাহার সাহায্য করিবে? যে পলাশপুর গ্রামে তাহাদের উভয়ের বাল্য, কৈশোর, যৌবনের এত দিন সুখে দুঃখে কাটিয়াছে, সে গ্রাম বুঝি আর তাহাদিগকে ধরিয়া রাখিতে পারে না। স্বামী স্ত্রীতে পরামর্শ করিল, গ্রামের আর কাহাকেও কিছু না বলিয়া এক দিন রাত্রিশেষে তাহারা পলায়ন করিবে। পলায়নের দিন স্থির হইল।

দেখিতে দেখিতে সে দিন আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন তাহারা দরিদ্রের সম্বল যাহা কিছু ছিল লইয়া ধীরে ধীরে তাহাদের সেই শান্ত—শীতল সুখ-নিকেতন হইতে চিরদিনের মত বিদায় লইবার জন্য একবার সেই প্রাচীন, ঋষিতুল্য শালবৃক্ষের ছায়ায় দাঁড়াইয়া, বাল্য, কৈশোর, যৌবনের অতীত শত সুখস্মৃতির মধ্যে আত্মহারা হইয়া উঠিল। তখন রাত্রি শেষ হইয়া আসিয়াছে। প্রভাতের শীতল বায়ু বৃক্ষপত্র কাঁপাইয়া জগতের সুপ্ত শান্তিকে ধীর আহ্বানে জাগরিত করিতেছিল। তাহারা স্বামীস্ত্রীতে বহুক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া বিদায় গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিল; কিন্তু সেই জীর্ণ কুটীরখানির প্রতি পর্ণ, প্রতি বন্ধন, প্রতি ক্ষুদ্র কাষ্ঠখণ্ড যেন তাহাদিগকে শত হস্ত প্রসারিত করিয়া স্নেহালিঙ্গনে বাঁধিয়া রাখিতে চাহিল। মতিয়া ও ভৈরী এই নির্ব্বাসন যাত্রায় যেন অমঙ্গল সূচনা দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইল। তাহাদের স্বহস্ত-রোপিত বৃক্ষশিশুগণ যেন ক্ষুদ্র পল্লবহস্ত কম্পিত করিয়া তাহাদিগকে ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিল; প্রাঙ্গণের বৃক্ষশাখায় বসিয়া পাখীরাও যেন তাহাদের বিদায়ে অমঙ্গল সূচনা করিল; কিন্তু জঠর-যন্ত্রণায় কাতর মতিয়া স্ত্রীর হাত ধরিয়া অগ্রসর হইল—একটী দীর্ঘনিঃশ্বাসে শত বন্ধন ছিন্ন করিয়া নিশীথে দুঃস্বপ্নবিহ্বল জাগরণের ন্যায় কৈশোরের আশাকানন, যৌবনের স্বপ্নশয্যা—পশ্চাতে ফেলিয়া বাঁকুড়ার রাজপথে উপস্থিত হইল।

মতিয়া দু একবার রাণীগঞ্জে গিয়াছিল। রাণীগঞ্জের কয়লার খনিতে শত শত নরনারীকে কাজ করিতে দেখিয়াছিল,—তাই তাহার মনে হইয়াছিল বুঝি রাণীগঞ্জে গেলেই যে প্রকারে হউক তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদনের ভাবনা থাকিবে না। এই আশায় বুক বাঁধিয়াই দুইজনে রাণীগঞ্জের পথ ধরিল।

মতিয়া ও ভৈরী উভয়ের শরীরই বলিষ্ঠ। পথ চলিতে তাহারা

কাতর নহে। কিন্তু কি যেন এক অজানিত আশঙ্কায় পদে পদে তাহাদের গতি মন্দ হইতে লাগিল। খানিক দূর যায়, আর বৃক্ষতলে বসিয়া পড়ে। এক এক বার মনে করে, কাজ নাই দুটি অন্নের চেষ্টায় রাণীগঞ্জে যাওয়া—ঘরে ফিরিয়া যাই—যেমন করিয়া হউক দিনপাত হইবেই হইবে। পলাশপুরের বনের শাকপাতা, ফলমূল খাইয়া জীবন কাটাইয়া দিবে;—কিন্তু পরক্ষণেই মনে হয় পলাশপুরে গেলে অনাহারে মৃত্যু নিশ্চিত। এই ভাবে নানাপ্রকার চিন্তা করিতে করিতে মধ্যাহ্ন সময়ে তাহারা রাণীগঞ্জে উপস্থিত হইল। সেখানে তাহাদের পরিচিত কেহই ছিল না; কোথায় আশ্রয় গ্রহণ করিবে কিছুই জানে না। সম্বল সামান্য কয়েকটী পয়সা মাত্র। তাহারই মধ্যে দুই পয়সা দিয়া মতিয়া ভুজা কিনিয়া আনিল এবং তাহারই দ্বারা যৎকিঞ্চিৎ ক্ষুধা নিবৃত্তি করিল।

এখন চিন্তা, কোথায় যাইবে; কয়লার খনিতে তাহারা কখনও কাজ করে নাই। কাজ প্রার্থনা করিতে হইলে কোথায় যাইতে হয়, তাহাও তাহারা জানে না। উভয়ে অনেকক্ষণ চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইল। শেষে ক্লান্ত হইয়া রেল-ষ্টেশনের তৃতীয় শ্রেণীর আরোহীদিগের বিশ্রাম-স্থানে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল। মনে করিল এখানে অনেক লোকের সমাবেশ হয়; কেহ না কেহ তাহাদিগকে আশ্রয় দিবে।

সন্ধ্যার সময় একটী লোক আসিয়া উহাদের নিকট বসিল। এই লোকটা অনেকক্ষণ ষ্টেশনে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। লোকটী বাঙ্গালী, কোন আফিসের জমাদার বা দ্বারবান বলিয়াই মনে হয়। মতিয়ার নিকট বসিয়া একে একে তাহাদের দুঃখের কথা শুনিয়া লোকটা এতই কাতর হইয়া পড়িল যে,মতিয়ার মনে হইল, ভগবান তাহাদের দুঃখে দুঃখী হইয়াই এই মহাত্মাকে তাহাদের সহায়তার জন্য পাঠাইয়া দিয়াছেন। লোকটা এমন ভাবেই কথা বলিতে লাগিল—যে মতিয়া ও ভৈরীর মন

গলিয়া গেল। শেষে লোকটা বলিল, "দেখ, আমিও তোমাদেরই মত গরিব মানুষ ছিলাম—আমিও একমুষ্টি অন্নের জন্য স্ত্রী ও শিশুপুত্র লইয়া দেশত্যাগী হইয়াছিলাম। তাহার পর এক জন লোক আমাদিগকে আসামের চা-বাগিচায় চাকরী দেয়। আমরা সেখানে তিন বৎসর চাকরী করি। তাহার পর দেখ, আর আমাদের চাকরী করারই দরকার থাকিল না—তিন বৎসরে এতটাকা জমাইয়া ফেলিলাম, যে আর কেন বিদেশে পড়িয়া থাকিব। তাই দেশে চলিয়া আসিয়াছি। এখন বেশ সুখে-স্বচ্ছন্দে আছি। তোমরাও ত চাকরীর জন্য এখানে এসেছ। রাণীগঞ্জে আর কি চাকরী মিলিবে। এখানে যে কয়টা কয়লার খনি আছে, তাহাতে চাকরী মিলে বটে, কিন্তু যে খাটুনী—বাবারে বাবা! আর এত খাটিয়াও কি পেট ভরে? সারাদিন পরিশ্রম করিয়া যা পাওয়া যায়, তাতে একটা লোকেরও চলে না। আর তার পর ছমাস কয়লার মধ্যে চাকরী করিলেই এমন শক্ত ব্যারাম হইয়া পড়ে যে, বেশী দিন বাঁচিবার সম্ভাবনা থাকে না। তোমরা গেঁয়ে লোক, কখন ত কাজ কর্ম্ম কর নাই; এই সবে প্রথম কাজ করিতে আসিয়াছ—যে সে কাজে যাইও না। তোমরা ভাল মানুষ তাই বলিতেছি; যদি সুখে থাকিতে চাও, যদি দুপয়সার মুখ দেখিতে চাও, তাহা হইলে আমার পরামর্শ শোন;—আসামে বাগিচায় যাও। তোমাদের যেমন শরীর তাতে তোমরা দুইবছর সেখানে থাকিলেই খাইয়া পরিয়া পাঁচশত টাকা ত নিশ্চয়ই জমাইতে পারিবে। আর সেখানে কাজ খুব কম—কাজ করিতে হয় না বলিলেই হয়। সকালে রৌদ্র উঠিবার আগে ঘণ্টাখানেক চায়ের পাতা তুলিতে হয়। আবার বিকাল বেলায় রৌদ্র সরিয়া গেলে আর ঘণ্টা খানেক পাতা তুলিতে হয়। এ যে কাজ, এ ত একটা পাঁচ বছরের ছেলেও পারে। তা

তোমরা যদি যেতে চাও, তবে আমি তার বন্দোবস্ত করে দিতে পারি। আমি সে দেশে ছিলাম কি না, তাই আফিসের সাহেব ও বাবুদের সঙ্গে আমার খুব ভাব আছে, আমাকে তাঁরা খুব খাতিরও করেন। আমি যদি একটা অনুরোধ করি, তাহ'লে তাঁহাদের অস্বীকার করিবার যো নাই। কি বল?"

মতিয়া লোকটার কথা শুনিয়া যেন হাতে স্বর্গ পাইল। সে তখনই আসামের বাগিচায় যাইতে স্বীকৃত হইল। তখন সেই আড়কাঠিটা বলিল, "তা ভাই—এখন ত আর বেলা নাই; এখন আফিসে গেলে ত আর সাহেবের সঙ্গে দেখা হবে না। তোমাদের যদি কোন আপত্তি না থাকে, তাহ'লে আজ রাত্রি আমার বাসাতেই থাকিতে পার, কাল প্রাতে সাহেবের সঙ্গে দেখা করাইয়া সমস্ত ঠিক করিয়া দিব।" মতিয়া ও ভৈরী তাহাতেই সম্মত হইল। আড়কাঠিটা তাহাদের দুইজনকে নিজের বাসায় লইয়া গেল, খুব আদর যত্ন করিয়া রাত্রে তাহাদের আহারের এমন ব্যবস্থা করিল যে, অনেক দিন তাহারা তেমন আহারের মুখও দেখে নাই। পরদিন প্রাতঃকালেই তাহারা সেলবী সাহেবের ডিপোতে গেল; কোন প্রকার দ্বিধা না করিয়া তাহারা হাসিতে হাসিতে এগ্রিমেণ্ট সহি করিল;—সেই রাত্রির গাড়ীতেই তাহাদের আসামে যাওয়ার বন্দোবস্ত হইল। মতিয়া গাড়ীতে বসিয়া বসিয়া আকাশে বাড়ী প্রস্তুত করিতে লাগিল। সে মনে করিল, দেখিতে দেখিতে তিন বৎসর কাটিয়া যাইবে। তিনবৎসর পরে সে আবার দেশে ফিরিয়া আসিবে—আবার পলাশপুরের সেই স্নেহ-শীতল শালবৃক্ষের ছায়ায় গিয়া বসিবে। তখন কি আর পর্ণকুটীর থাকিবে। মতিয়া তখন বড় করিয়া ঘর বাঁধিবে, লাঙ্গল—গরু কিনিবে, জমি লইবে। তখন তাহার ভাত খায় কে! এই সকল কল্পনায় তাহার শরীরে অসীম বলের সঞ্চার হইল—

বাগানে যাইয়া সে এমন ভাবে কাজ করিবে যে সাহেবেরা তাহার কাজে খুব খুসী হইবে, তাহার বেতন বাড়িয়া যাইবে—নানাদিক হইতে মুঠো-মুঠো টাকা তাহার ঘরে আসিবে। কাজ ত ভারি? দুইবেলা এক ঘণ্টা করিয়া পাতা-তোলা—সে কাজ ত সে কাজের মধ্যেই গণ্য করে না।

গ্রাম, নগর, পল্লী পার হইয়া কলের গাড়ী ছুটিতে লাগিল; গাড়ীর মধ্যে বসিয়া মনের আনন্দে মতিয়া ও ভৈরী তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবনের ছবি আঁকিয়া উৎফুল্ল হইতে লাগিল। তিন দিনের দিন তাহাদিগকে একটা স্থানে ষ্টীমার হইতে নামিতে হইল। সেখান হইতে বাগান তিন মাইলের মধ্যে।

যথাসময়ে মতিয়া ও ভৈরী পাতাচেড়া চা-বাগানে যাইয়া উপস্থিত হইল। প্রথম দিনে আর তাহাদিগের কোন কাজ করিতে হইল না—বাগিচার গুদাম হইতে তাহাদের রসদ দেওয়া হইল—বাগানের জমাদার তাহাদের ঘর স্থির করিয়া দিল। তাহারা দুইজনে ঘর গুছাইয়া বাগনের কাজ দেখিবার জন্য বাহির হইল—তাহাদের মন একটু দমিয়া গেল; রাণীগঞ্জে আড়কাটীর মুখে যাহা শুনিয়াছিল, কাজের সময় তাহা ত দেখিতে পাইল না। বাগানে ঘুরিয়া দেখিল, ভয়ানক পরিশ্রম করিতে হয়—কাজে একটু ত্রুটী হইলেই মার খাইতে হয়। তাহার পর সন্ধ্যার সময়ে তাহারই পাশের ঘরে যাহারা ছিল, তাহাদের নিকট বাগিচার কাজের কথা, অত্যাচারের কথা তাহারা শুনিল। ভৈরীর শরীর শিহরিয়া উঠিল—সে চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিল। তখন তাহারা বুঝিল, কি প্রলোভনে ভুলিয়া তাহারা তাহাদের সোনার কুটীর ছাড়িয়া আসিয়াছে। সেখানে ত অত্যাচার নাই—সেখানে ত অবিচার নাই। আর এ কোন্ দেশে, কোন্ নির্ব্বান্ধব স্থানে তাহারা আসিয়া

পড়িল। এখানে কে তাহাদের সহায় হইবে;—তাহাদের উপর অত্যাচার করিলে কি কেহ তাহাদের হইয়া দাঁড়াইবে। একদিনের মধ্যেই তাহাদের সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। মতিয়া ভয় পাইল বটে, কিন্তু সে পরিশ্রমে কাতর নহে—পরিশ্রম করিয়া সে কাজ আদায় করিতেই পারিবে। সে ভাবিল, সাহেবেরা ত কাজ চায়; সে কাজ করিতে পারিবে—তিনজনের কাজ সে একেলা করিয়া দিবে। কিন্তু ভৈরী বলিল, "দেখ, কাজের জন্য আমিও ডরাই না; কিন্তু আমার ভয়—সাহেব যদি অপমান করে—সাহেব যদি মান ইজ্জতের উপর হাত দিতে আসে তখন কি হইবে?" মতিয়া এই কথা শুনিয়া গর্জ্জিয়া উঠিল, বলিল, "এত বড় সাহস কাহার হইবে? আমার সম্মুখে তোর বেইজ্জৎ করিতে পারে, এমন বীর দেশে জন্মায় নাই। আমি থাকিতে তোর ভয় কি? সে কথা তুই ভাবিস না—মান ইজ্জত নিজের হাতে। দেশে বসে শীকার খেলিয়াছি, এখানে না হয় আর একবার শীকার খেলিব—দেখিব কার কতখানি গোস্তাকী। কোন ভয় নাই ভৈরী!" ভৈরী সেই কথাই বুঝিল, কিন্তু তবুও তাহার হৃদয়ে থাকিয়া থাকিয়া আশঙ্কার উদয় হইতে লাগিল; সে যেন দিব্যচক্ষে দেখিল, তাহার মান ইজ্জত লইয়া টানাটানি হইবে। এ কথা ভাবিবার তাহার একটা বিশেষ কারণ ছিল। তাহার গ্রামে সে সুন্দরী বলিয়া বিখ্যাত ছিল। বাস্তবিকই ভৈরীর সেই কালো রংয়ের মধ্য হইতেই সৌন্দর্য্য ফুটিয়া বাহির হইত। সতর বৎসর বয়স, শরীর সুগঠিত, যৌবনের জ্যোতিঃ তাহার সর্ব্বাঙ্গ ছাইয়া ফেলিয়াছিল। তাহার রূপের একটী শক্তি ছিল;—সেই রূপই যে তাহার কাল হইবে, এ কথা সে বুঝিতে পারিল। ভৈরী সে কথা প্রকাশ করিল না—মনে মনে অগতির গতি ভগবানকে ডাকিল। একবার তাহার স্বামীর দিকে চাহিল—এত কাল পরে

একবার সে চাহিয়া দেখিল ঐ দুইখানি দৃঢ় হস্তে কত বল। সে দেখিতে পাইল তাহার স্বামীর মত স্বামী আর হয় না—এমন সুপুরুষ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আর নাই। কেমন বলিষ্ঠ দেহ;—কাহার সাধ্য যে মতিয়ার সঙ্গে লড়াই করিয়া জিতে। আর সে নিজেও ত দুর্ব্বলা নহে। তখন তাহার মনে হইল, তিন বৎসর পূর্ব্বে সে একটা জঙ্গলা মহিষকে কেমন করিয়া পরাজয় করিয়াছিল। এখনও যদি কেহ তাহার উপর আক্রমণ করে, তাহা হইলে সে আত্মরক্ষা করিতে পারিবে। তাহার প্রাণে বলসঞ্চার হইল। ক্রমে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল—চারিদিকে ঝিঁঝিঁপোকা ডাকিতে লাগিল; আকাশে নক্ষত্র উঠিল, বাগান নীরব হইল। তাহারা দুইজন তখন ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া কুটীরে প্রবেশ করিল।

পাঁচ সাত দিন তাহারা বেশ কাজ করিতে লাগিল; জমাদার তাহাদের কাজ দেখিয়া খুসী হইল—তাহাদের খুব প্রশংসা করিতে লাগিল। তাহারা বুঝিল বিপদ কাটিয়া গিয়াছে।

বাগানের বড় সাহেব বুড়া মানুষ—লোকও ভাল। পূর্ব্বে না কি সেও খুব অত্যাচার করিত, কিন্তু এখন আর কাহারও উপর অত্যাচার করে না—বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাহার মতিও স্থির হইয়াছে। কিন্তু বাগানে আর একটী ছোকরা সাহেব আছে—সে ছোট সাহেব। ছোট সাহেব এ কয়দিন বাগানে নাই, কলিকাতায় গিয়াছে; তাই মতিয়া তাহাকে দেখিতে পায় নাই। শনিবার রাত্রে ছোট সাহেব কলিকাতা হইতে বাগানে ফিরিয়া আসিল।

রবিবার প্রাতেই যথানিয়মে ছোট সাহেব ভ্রমণে বাহির হইয়াছে। প্রথমেই সে কুলী লাইনের দিকে আসিল, সঙ্গে বাগানের জমাদার। মতিয়ার ঘর কুলী লাইনের এক প্রান্তে ছিল। সাহেব সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন ভৈরী বাহিরে বসিয়া বাসন মাজিতেছিল।

ছোট সাহেবের দৃষ্টি তাহার উপর পড়িল। সাহেব আসিয়াছে দেখিয়া ভৈরী যে মাথা অবনত করিয়াছিল, আর সে মাথা তোলে নাই। তাই সে দেখিতে পাইল না, ছোট সাহেবের দৃষ্টি কি ঘৃণিত লালসাপূর্ণ। ছোট সাহেব একটু দাঁড়াইয়া থাকিল, তাহার পরই সে দিক হইতে চলিয়া গেল। কেহই কিছু বুঝিতে পারিল না।

সন্ধ্যার সময় মুনিয়া আসিয়া তাহাদের কুটীরে উপস্থিত হইল। মুনিয়া ছোট সাহেবের আয়া। মুনিয়ার বয়স বোধ হয় ত্রিশ পঁয়ত্রিশ হইবে। বাগানে তাহার অসীম প্রতাপ—সে ছোট সাহেবের বিশেষ প্রিয়পাত্রী। মুনিয়ার খবর ইতিপূর্ব্বেই মতিয়া ও ভৈরী পাইয়াছিল; তাই তাহাকে আসিতে দেখিয়া ভৈরীর মনে সন্দেহ হইল। মতিয়া তখন কুটীরে নাই—পাশের আর একজন কুলীর ঘরে সে গিয়াছিল। মুনিয়া আসিয়া ভৈরীর কুটীরের দাবায় বসিল এবং কোন প্রকার ভূমিকা না করিয়াই একেবারে বলিয়া বসিল, "ভৈরী, তোর খুব জোর কপাল। ছোট সাহেবের তোর উপর নজর পড়িয়াছে; আজ রাত্রেই তোকে ছোট সাহেবের কামরায় যাইতে হইবে। দেখ্ ভাই, তোর ত কপাল ফিরিল, দেখিস্ যেন মুনিয়াকে ভুলিয়া না যাস্। এখন ত তোর সাত খুন মাপ। তোকে কি আর কাজ করিতে হইবে। ছোট সাহেব লোক ভাল,—অনেক টাকা কড়ি দিবে, ভাল কাপড় দিবে, বিলাত থেকে কত জিনিষ আনাইয়া দিবে। তুই ত মেম সাহেব হইয়া যাইবি। আজ রাত্রি আটটার সময় আসিয়া আমি তোকে লইয়া যাইব। এই প্রথম সাহেবের কাছে যাইবি, তোর যা ভাল কাপড় আছে—তাই পরিয়া যাস। তার পর কা'লই সাহেব তোর জন্যে গুলবাহার সাড়ী আনাইয়া দিবে। তারপর বিবির পোষাক আসিতে আর কয়দিন। তৈয়ার হইয়া থাকিস্ ভাই। আমি আর বসিতে পারিতেছি না। আমার

অনেক কাজ আছে। রাত্রি আটটার সময় আমিই আসি, আর বেহারাই আসে, তারই সঙ্গে চলিয়া যাস্।"

ভৈরী মুনিয়ার কথাগুলি সমস্তই শুনিল, একটা কথায়ও জবাব দিল না। মুনিয়া ভুল বুঝিল—সে মনে করিল, এই সৌভাগ্যের কথা ভাবিয়াই ভৈরী আনন্দে অধীরা হইয়াছে, তাই তাহার মুখ দিয়া কথা বাহির হইতেছে না। মুনিয়া চলিয়া গেল।

ভৈরী দেখিল সম্মুখে ঘোর বিপদ। তখন সে তাহার স্বামীর অনুসন্ধানে গেল;—মতিয়া নিকটেই একটা কুটীর-প্রাঙ্গণে বসিয়া আর একজনের সহিত গল্প করিতেছিল। ভৈরীকে আসিতে দেখিয়াই সে উঠিল, এবং দুইজনে কুটীরে ফিরিয়া আসিল। তখন ভৈরী ধীরে ধীরে মুনিয়ার পাপ প্রস্তাবের কথা মতিয়াকে বলিল। মতিয়া তাহার কথা শেষ হইতেও দিল না—সিংহের মত গর্জ্জন করিয়া উঠিল, বলিল, "মাগীকে তখনই ভাল করিয়া শিখাইয়া দিতে পারিস্ নাই। আমি ঘরে থাকিলে আর তাহাকে ফিরিয়া যাইতে হইত না, এখানেই তাহার দফা শেষ করিতাম।" ভৈরী বলিল "অত গোল করিলে চলিবে না। এখানে আমাদের কেউ নাই; এই বাগিচায় সাহেব যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারে। এখন পরামর্শ স্থির কর।"

তখন দুইজনে মিলিয়া পরামর্শ করিল; মতিয়া একবার বাহিরে যাইয়া কি দেখিয়া আসিল। কোন্ পথে কেমন করিয়া পলায়ন করিবে তাহারা সেই পরামর্শ আঁটিল। স্থির হইল ছোট সাহেবকে ভালরকম শিক্ষা দিয়া তাহারা সেই রাত্রেই পলায়ন করিবে। জঙ্গলে বাঘে খায়, সাপে খায় সেও ভাল, তবু তাহারা সে বাগানে আর থাকিবে না। ভৈরী বলিল, "কাজ কি সাহেবের সঙ্গে মারামারি করিয়া, চল আমরা এখনই পলায়ন করি।" মতিয়া তাহাতে সম্মত হইল না—সাহেবকে একটু

শিক্ষা না দিয়া সে কিছুতেই পলায়ন করিবে না। শেষে তাহাই স্থির হইল।

রাত্রি আটটার সময়ে মুনিয়া নিজেই আসিয়া উপস্থিত হইল;—ভৈরী সাহেবের বাঙ্গালায় যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে দেখিয়া সে খুসী হইল। মতিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ভাই, ভৈরীকে আবার কখন রাখিয়া যাইবে?" মুনিয়া বলিল—"প্রাতঃকালে সে আসিবে। আজ সমস্ত রাত্রিই তাহাকে বাঙ্গলায় থাকিতে হইবে।" মতিয়া বলিল, "বেশ কথা।"

তখন মুনিয়া ও ভৈরী দুই জনে ঘরের বাহির হইল; মতিয়া তাহার সেই পাকা বাঁশের লাঠিখানি লইয়া তাহাদের অনুসরণ করিল। একটা ঘোরা পথ দিয়া সে ছোট সাহেবের কামরার পাশে গেল। গোসল-খানার বাহিরের দ্বার ঠেলিয়া দেখিল, দ্বার খোলা আছে। তখন চোরের মত সেই দ্বার দিয়া সে গোসলখানার মধ্যে প্রবেশ করিল।

ভিতর দিকের দ্বারে ঠেলা দিয়া দেখিল সে দ্বারও খোলা আছে। মতিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। লাঠিখানি শক্ত করিয়া ধরিয়া সে দাঁড়াইয়া থাকিল।

মুনিয়া ও ভৈরী ছোট সাহেবের কামরায় প্রবেশ করিল। ছোট সাহেব মুনিয়ার দিকে চাহিয়া বলিল, "তুই ঘরে যা; আবার ডাকিলে আসিস্।" মুনিয়া চলিয়া গেল। ভৈরী চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সাহেব তখন তাহাকে শয়নঘরে যাইবার জন্য ইঙ্গিত করিয়া নিজে অগ্রসর হইল; ভৈরী কলের পুতুলের মত শয়নঘরে গেল—কোন আপত্তি করিল না।

সাহেব তখন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া ভৈরীর গায়ে হাত দিতে আসিল; ভৈরী দুই পা সরিয়া দাঁড়াইল। সাহেব তখন বলিল, "আও বিবি!"

কথা শেষ হইতে না হইতেই রণচণ্ডীর মত ভৈরী কাঁপিয়া উঠিল—তাহার পরেই এক দুর্জ্জয় পদাঘাত। সাহেব প্রস্তুত ছিল না—সাঁওতাল যুবতীর এক পদাঘাতেই সাহেব একেবারে চিৎ হইয়া পড়িয়া গেল, আর তখনই পাশের ঘর হইতে মতিয়া আসিয়া সাহেবের মুখ চাপিয়া ধরিল—সাহেবের বুকের উপরে বসিয়া পড়িল; সাহেবের আর নড়িবার শক্তি রহিল না। ভৈরী তখন একখানি তোয়ালে দিয়া সাহেবের মুখ বাঁধিয়া ফেলিল—তাহার পর বিছানার চাদর তুলিয়া তাহার দ্বারা সাহেবের হাত পা বাঁধিল। তখন মতিয়া বলিল, "দে ভৈরী, উহার মুখে আর একটা লাথী।" ভৈরীর আর সাহসে কুলাইল না—সে তখন কাঁপিতেছিল। সাহেবকে ঐ অবস্থায় ফেলিয়া তাহারা দুইজনে গোসলখানার দ্বার দিয়া বাহির হইল। তাহার পর তাহারা কোথায় যে অন্ধকারে মিশিয়া গেল—আজও তাহার খোঁজ হইল না।

সাঁওতাল রমণীর এক লাথি খাইয়াই পাতাচেরা বাগিচার ছোট সাহেবের মতি ফিরিয়া গিয়াছিল—সে তাহার পর হইতে আর কখনও কাহারও উপর অত্যাচার করে নাই। সতী রমণীর পদাঘাত বুঝি ঐ রোগের খুব ভাল ঔষধ। আমরা অনেককেই একবার এই মহৌষধের পরীক্ষা করিতে অনুরোধ করি।

সুষমা

এগার বৎসর কমিসেরিয়েটে চাকুরী করিয়া যদু ভট্চাজ যখন রাউল-পিণ্ডির মায়া ত্যাগ করিয়া দেশে চলিয়া আসিলেন, তখন তিনি সঙ্গে আনিলেন এক রাশি কোম্পানীর কাগজ, জামাতৃশোকাতুরা পত্নী, আর তের বৎসরের বিধবা কন্যা সুষমা।

যদু বাবুর কেবলমাত্র এক কন্যা—এ দিকে চাকুরীর আয়ও যথেষ্ট; কাজেই মেয়েটীকে অল্পবয়সে বিবাহ দিয়া জামাই লইয়া সাধ-আহ্লাদ করিবার ইচ্ছা তাঁহার মনে হওয়া অসম্ভব নহে। তাই তিনি অনেক চেষ্টা করিয়া কানপুরের একটী ভদ্রলোকের ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিবাহ দিলেন—বিবাহে প্রায় বাইশ হাজার টাকা ব্যয় করেন। বিবাহের পর পাঁচ মাসও গেল না—যদু বাবুর বড় সাধের একমাত্র কন্যা সুষমা বিধবা হইল। স্বামী চিনিতে না চিনিতেই চিরবৈধব্য আসিয়া বালিকার সকল সুখের বাসা ভাঙ্গিয়া দিল।

আর কাহার জন্য—কিসের জন্য চাকুরী। গৃহিণী বলিলেন, "এ পোড়া রাউলপিণ্ডীতে আর থাকিব না, দেশেও আর এ মুখ দেখাইব না। চল, কাশীতে বাবা বিশ্বেশ্বরের ধামে জীবনের বাকি কয়টা দিন কাটাইয়া দিই।"

যদু বাবুর তাহাতে মন উঠিল না—তিনি ধর্ম্ম-কর্ম্ম তেমন মানিতেন না—তীর্থশ্রেষ্ঠ কাশীর উপর তাঁহার তেমন ভক্তি ছিল না—বালবিধবা কন্যা লইয়া কাশীবাসের ব্যবস্থা তাঁহার মনের মত হইল না—অথচ রাউলপিণ্ডিতেও আর বাস করা যায় না। যে বাড়ীর প্রত্যেক বস্তুর

সঙ্গে সুষমার মূর্ত্তি জড়িত—সে বাড়ীতে, সে স্থানে বাস করা অসম্ভব হইয়া উঠিল। সুষমা যদি আরও একটু কম বয়সে বিধবা হইত—তাহা হইলে সে অনেক পরিমাণে স্মৃতির দংশন হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারিত। পয়সাওয়ালা ভদ্রলোকের তের বৎসরের মেয়ে নিতান্তই বালিকা নহে;—সুষমা লেখাপড়া শিখিয়াছিল—বাঙ্গালা, ইংরাজী, সংস্কৃত পড়িয়াছিল—বিবি মাষ্টারের কাছে সূচিকর্ম্ম ও হারমোনিয়ম বাজানোও অভ্যাস করিয়াছিল—দু'দশখানা বাঙ্গালা উপন্যাসও পড়িয়াছিল; সুতরাং বয়স তের বৎসর হইলেও তাহার স্বামী চিনিতে বিলম্ব হয় নাই। সবে মাত্র সে স্বামীসুখ-ভোগে প্রবৃত্ত হইয়াছিল—সবে মাত্র তাহার বালিকা-জীবনে যৌবনের রেখাপাত হইতেছিল—সবে মাত্র তাহার হৃদয়াকাশে পূর্ণচন্দ্র উঠিতেছিল—সবেমাত্র তাহার প্রাণের মধ্যে যৌবনের জ্যোৎস্না উঁকি মারিতেছিল—সেই সময় তাহার সমস্ত সুখের কল্পনা—তাহার জীবনের আনন্দ-কানন কোথায় অন্তর্হিত হইল। একদিনের একখানি এক পয়সার পোষ্টকার্ড তাহার জীবনের সকল সাধ-আহ্লাদ হরণ করিয়া লইয়া গেল।

যদু বাবু দেশে ফিরিয়া আসাই কর্ত্তব্য মনে করিলেন। তাই এগার বৎসর পরে স্ত্রী ও বিধবা কন্যা লইয়া তিনি তাঁহার নিভৃত পল্লীগ্রামে ফিরিয়া আসিলেন। তিনি ভাবিলেন সহরের কোলাহল, সহরের ভোগ-বিলাস হইতে দূরে পল্লীগ্রামের সুশীতল ছায়ায় বসাইয়া তিনি তাঁহার সুষমার হৃদয়কে শান্ত করিবেন—তাহার জীবনকে পল্লীময় করিয়া ফেলিবেন—তাহার হৃদয় হইতে বিলাস ও সুখের স্মৃতি মুছিয়া দিবেন। ইহাই তাঁহার পল্লীবাসের মুখ্য অভিপ্রায়।

বাড়ীতে এক বুড়া পিসিমা ছাড়া তাঁহার আর কেহ ছিল না। পৈতৃক একটী নারায়ণশিলা ছিলেন, আর বিশ পঁচিশ বিঘা ব্রহ্মোত্তর ছিল। পিসিমা সেই জমির খাজনা আদায় করিতেন, ধান পাইতেন,

আর ঠাকুরদের সেবা করিতেন। যদুবাবু সর্ব্বদাই পিসিমার খরচের জন্য টাকা পাঠাইয়া দিতেন; কিন্তু পিসিমার আর খরচ কি? বাড়ীতে তিনি আর অনেক দিনের পুরাতন ভৃত্য রমানাথ। রমানাথেরও ত্রিজগতে আর কেহই ছিল না; সে ভট্‌চাজবাড়ীর কাজকর্ম্ম করিত, পিসিমার ফরমাস খাটিত, আর দিনান্তে ভট্‌চাজ বাড়ীর নোনাধরা পুরাতন একতলা বৈঠকখানার বারান্দায় বসিয়া হরিনাম করিত।

যদু বাবু বাড়ীতে আসিয়া কি ব্যবস্থা করিবেন, তাহা পূর্ব্ব হইতেই স্থির করিয়াছিলেন। কমিসেরিয়েটের চাকুরীতে বিলক্ষণ দু'পয়সা প্রাপ্তি ছিল; যদু বাবুও অনেক টাকা জমাইয়াছিলেন। পরের ধন সকলেই বেশী দেখে। অনেকেই বলিল, যদুবাবু চার পাঁচ লাখ্ টাকা জমাইয়াছেন; কিন্তু আমাদের মনে হয় এত টাকা তাঁহার ছিল না, তবে, লাখ টাকার উপর যে তাঁহার ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

যদু বাবু বাড়ীতে আসিয়াই পুরাতন বাড়ী সংস্কার করিলেন, নূতন বাড়ীঘর প্রস্তুত করিলেন না। পাড়ার দশজনে মনে করিয়াছিল যে, এত বড় একটা চাকুরে এত টাকা লইয়া দেশে আসিলেন, দেশে একটা হৈ-হৈ রৈ-রৈ পড়িয়া যাইবে; পাড়ার নিষ্কর্ম্মা লোকেদের একটা আড্ডা জমিবে; পেশাদার মোসাহেবদিগের দিনপাতের সুবিধা হইবে; কিন্তু যদু বাবুর কাজকর্ম্মের ব্যবস্থা দেখিয়া অনেকেই নিরাশ হইলেন, কেহ কেহ তাঁহাকে মহাকৃপণ বলিয়াও দেশে রাষ্ট্র করিল। যদু বাবু কাহারও কথায় কর্ণপাত করিলেন না, কাহারও অযাচিত সুপরামর্শও গ্রহণ করিলেন না। দুই একজন মুরুব্বী-শ্রেণীর বৃদ্ধ যদু বাবুর জামাতার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়া ধীরে ধীরে পুনরায় দারপরিগ্রহ করিয়া বংশরক্ষার প্রস্তাবও করিলেন, এবং তাহাতে যদি নিতান্তই অনিচ্ছা হয়, তাহা হইলে অন্ততঃ একটি পোষ্যপুত্র গ্রহণ করা অতীব কর্ত্তব্য,

তাহা প্রতিপাদন করিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। এত ধনদৌলত কে ভোগ করিবে—মধু ভট্‌চাজের নাম যে একেবারে লোপ হইবে, তাহা তাঁহাদের নিতান্ত অসহ্য বোধ হইল। মধু ভট্‌চাজ গ্রামের দশজনের একজন ছিলেন; তাঁহার উপযুক্ত পুত্র যদু ভট্‌চাজ যে বুদ্ধির দোষে বাপ পিতামহের নাম ডুবাইবে, ইহা শুভানুধ্যায়ী মহাশয়গণের নিকট কিছুতেই কর্ত্তব্য বোধ হইল না। কিন্তু যদুবাবু এ সকল অকাট্য যুক্তির কোনই প্রতিবাদ করিলেন না; সকলই শুনিতে লাগিলেন। শুভানুধ্যায়ীরা দেখিলেন এ পশ্চিম-ফেরত লড়াইয়ে ব্রাহ্মণকে সুপরামর্শ দান বৃথা। সুতরাং ক্রমে তাঁহারা রণে ভঙ্গ দিতে লাগিলেন। যদুবাবুও এই সকল উপদেশের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিলেন।

বাড়ীর আবশ্যক সংস্কার-কার্য্য শেষ হইলে যদু ভট্‌চাজ পুরোহিত ঠাকুরকে ডাকিয়া দেবালয়ের ভিত্তি-স্থাপনের একটা শুভদিন দেখিতে বলিলেন; ঠাকুর দিন স্থির করিয়া দিলেন। যথাসময়ে দেবালয়ের ভিত্তি স্থাপিত হইল; তাহার পর আট নয় মাসের মধ্যেই বাড়ীর বাহিরে একটী অনতিবৃহৎ মন্দির প্রস্তুত হইল; ভোগশালা, অতিথিশালা নির্ম্মিত হইল, সুন্দর সরোবর খনিত হইল, উদ্যানে পুষ্পবৃক্ষ রোপিত হইল। তাহার পর একদিন মহাসমারোহে দেবালয় প্রতিষ্ঠা হইল; গৃহদেবতা নারায়ণশিলা এই নবনির্ম্মিত দেবালয়ে আসন গ্রহণ করিলেন —আর শুভ্র-বস্ত্র-পরিহিতা চতুর্দ্দশবর্ষীয়া বিধবা সুষমা এই দেবালয়ের সম্পূর্ণ ভার প্রাপ্ত হইল। যদু ভট্টাচার্য্য যাহা মনে স্থির করিয়া কাশীধাম ত্যাগ করিয়া বাঙ্গালা দেশের এই নির্জ্জন পল্লীতে আগমন করিয়াছিলেন, তাহারই ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। বিধবা কন্যাকে প্রকৃত ব্রহ্মচারিণী দেবসেবিকা করাই তাঁহার অভিপ্রায় ছিল—তিনি বহু অর্থব্যয়ে তাহাই করিলেন। তাঁহার মন অনেকটা নিশ্চিন্ত হইল।

সুষমাও ইহারই জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। দেবচরণে আত্মনিবেদন ব্যতীত তাহারও উপায়ান্তর ছিল না। হৃদয় হইতে সংসার-বাসনা সমূলে উৎপাটিত করিয়া ফেলিবার জন্য চতুর্দ্দশবর্ষীয়া বালিকা প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল; যত প্রকার কঠোর ব্রত করা যাইতে পারে, সে তাহাতেই প্রবৃত্ত হইল। পিতামাতা কেহই নিষেধ করিলেন না। তাপতপ্ত নিদাঘের একাদশী তিথিতে তাহার কণ্ঠ শুষ্ক হইলেও সে অধীরা হইত না;—একাগ্রচিত্তে তাহার সেই গৃহদেবতা জনার্দ্দনের মন্দিরে বসিয়া তাঁহাকে ডাকিত—তাঁহারই ধ্যানে নিমগ্ন থাকিত। ক্রমে তাহার দেহে অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ প্রকাশিত হইতে লাগিল—তাহার মুখের দিকে চাহিলে অতি বড় পাষণ্ডেরও মনে ধর্ম্মভাব ক্ষণেকের জন্য জাগ্রত হইত।

জনার্দ্দনের পূজা, অতিথিসেবা, শাস্ত্রাধ্যয়ন ইহাই তাহার জীবনের কার্য্য হইল; কিন্তু তবুও থাকিয়া থাকিয়া এক একদিন তাহার হৃদয়ের মধ্যে যেন কেমন একটা শূন্যতা আসিয়া উপস্থিত হইত। সে কত চেষ্টা করিত, কতবার জনার্দ্দনকে ডাকিত, কতদিন মন্দিরের মধ্যে ভূমিশয্যায় লুটাইয়া পড়িয়া কাতরকণ্ঠে দেবতাকে ডাকিত—তবুও তাহার এ দুর্ব্বলতা যাইত না। মধ্যে মধ্যে কোথা হইতে বাসনার প্রবল-বহ্নি এক একবার জ্বলিয়া উঠিত। সুষমা ভয়ে জড়সড় হইত; ভাবিত, কিছুতেই কি ভোগ-বাসনা তাহাকে ত্যাগ করিবে না—কিছুতেই কি সামান্য পাঁচ মাসের স্মৃতি সে মুছিয়া ফেলিতে পারিবে না—কিছুতেই কি সে জনার্দ্দনের পাদপদ্মে প্রাণমন সঁপিয়া দিতে পারিবে না। এত কঠোর ব্রতনিয়ম সকলই কি ব্যর্থ হইয়া যাইবে? জীবনান্ত ব্যতীত কি তাহার চিত্তশুদ্ধি হইবে না? কে তাহার এ প্রশ্নের সদুত্তর দিবে, কে তাহার হৃদয়ের এই জ্বালা নিবারণ করিবে?

এই অবস্থায় আরও চারি বৎসর কাটিয়া গেল। সুষমা সেই একই ভাবে জনার্দ্দনের পূজা করে, তেমনই অতিথিসেবা করে, তেমনই দিন কাটায়,—আর তেমনই মধ্যে মধ্যে অকস্মাৎ তাহার হৃদয়ের ভিতর দিয়া কালবৈশাখীর মত একটা প্রবল হাহাকার বহিয়া যায়।

এই সময় একদিন বৃন্দাবন হইতে যদুবাবুর গুরুপুত্র আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যদুবাবু যখন রাউলপিণ্ডীতে থাকিতেন, তখন গুরুদেব মধ্যে মধ্যে সেখানে যাইতেন; যদুবাবু দেশে আসিবার পরে আর গুরুদেব আসিতে পারেন নাই—এতদিন পরে পুত্রকে পাঠাইয়াছেন। যদুবাবু গুরুপুত্রকে সমাগত দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন।

গুরুপুত্র নবীন যুবক, বাইশ তেইশ বৎসর মাত্র বয়স; সুকুমার, সুশ্রী। যেমন বর্ণ, তেমনই অঙ্গসৌষ্ঠব, তেমনই ভাষার লালিত্য। ইহা ব্যতীত গুরুপুত্রের আর একটী গুণ ছিল, তিনি অতি উৎকৃষ্ট কথকতা করিতে পারিতেন। সমগ্র শ্রীমদ্ভাগবত তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। যদুবাবু মনে করিলেন, গুরুপুত্র যখন আসিয়াছেন, তখন ঠাকুরবাড়ীতে একমাস ভাগবত পাঠ হউক। সুষমা ইহাতে আপত্তি করিল না, বিশেষ আগ্রহের সহিতই সম্মতি প্রদান করিল।

শুভদিন দেখিয়া পাঠ আরম্ভ হইল। গ্রামের বহু লোক প্রত্যহ অপরাহ্নে ভাগবত-পাঠ শ্রবণ করিতে আসিতেন। প্রথম কয়েকদিন সুষমা গুরুপুত্রের সম্মুখে বাহির হইল না; কিন্তু গুরুপুত্র তাহারই গৃহে সমাগত—কয়দিন সম্মুখে বাহির না হইয়া থাকা যায়। গুরুপুত্রের সম্মুখে বাহির হইবার তাহার অন্য আপত্তিও ছিল; কিন্তু সে কথা সে মুখ ফুটিয়া কাহাকে বলিবে? সে ত বলিবার কথা নহে। গুরুপুত্র মুখে ভাগবত পাঠ করিতেন, সুষমা একাগ্রমনে তাহাই শুনিবার চেষ্টা করিত; কিন্তু কি জানি কেন তাহার চক্ষু হইতে একটী করুণ চাহনি

তাহাকে লুকাইয়া যুবকের অনিন্দ্যসুন্দর রূপের দিকে ছুটিয়া যাইত। তাঁহার সুমধুর কণ্ঠস্বরেই সুষমার হৃদয় আর্দ্র হইত; শাস্ত্রকথা তাহার কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশের অবকাশ পাইত না। তাহার পর বাধ্য হইয়া তাহাকে যখন গুরুপুত্রের সম্মুখে বাহির হইতে হইল, তখন তাহার সঙ্কোচের ভাব সমধিক বর্দ্ধিত হইল। সঙ্কোচ দুই রকমের, এক স্বাভাবিক সঙ্কোচ, আর এক জোর করিয়া সঙ্কোচ। সুষমা সঙ্কোচের গুণ্ঠনে আপনার প্রবৃত্তিকে প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখিবার জন্য সর্ব্বদা চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহার এ ভাব আর কেহ বুঝিতে পারিল না, কিন্তু দ্বাবিংশবর্ষীয় সুকুমারকান্তি যুবক গুরুপুত্রের নিকট তাহা গোপন রহিল না। সুষমার অতুল রূপরাশি দর্শনে যুবকের মনেও একটা বাসনা জাগ্রত হইয়াছিল। সেই জন্যই তিনি অতি অল্প আয়াসেই সুষমার অতিরিক্ত সঙ্কোচের মর্ম্ম বুঝিতে পারিলেন।

সুষমা কি করিবে? তাহার এতদিনের সাধনা, এতকালের ব্রহ্মচর্য্য, এত কঠোর ব্রত-নিয়ম সমস্তই বুঝি প্রবৃত্তির পঙ্কিল স্রোতে ভাসিয়া যায়। এতদিন সুষমার হৃদয়ের মধ্যে যে হাহাকার—যে অতৃপ্ত বাসনা মধ্যে মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিত, এখন তাহা দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠিল। সুষমার তখন মনে হইল "কি অপরাধে আমার এই শাস্তি? পৃথিবীতে সকলে সুখভোগ করিবে, আর আমি চিরদিন বাসনার তুষানল বুকের মাঝে জ্বালিয়া রাখিব? কেন আমি এই ভরা-যৌবনে যোগিনী হইব? বিনাপরাধে সমাজের এ কঠোর শাস্তি কেন আমি বহন করিব? যা থাকে অদৃষ্টে—আমি ডুবিব।" সুষমা এই কথা বলিল বটে, কিন্তু তাহার প্রাণের এক নিভৃত কোণ হইতে কে যেন অতি স্পষ্টস্বরে বলিল, —"সাবধান, সাবধান, মোহ ক্ষণিক!"—ভীতা শঙ্কিতা ব্যথিতা অভাগিনী দিব্যকর্ণে এই দৈববাণী শুনিল—তাহার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল।

তখন রাত্রি তৃতীয় প্রহর অতীত হইয়াছে। সুষমাকে কে যেন হাত ধরিয়া শয্যা হইতে তুলিল, কে যেন অঙ্গুলি-সঙ্কেতে তাহাকে ডাকিতে লাগিল। সুষমা আহ্বান উপেক্ষা করিতে পারিল না—শয্যা-ত্যাগ করিয়া যন্ত্রচালিত পুত্তলিকার ন্যায় চলিতে লাগিল। সহসা তাহার জ্ঞানের সঞ্চার হইল; দেখিল সে জনার্দ্দনের মন্দিরের দ্বারে উপস্থিত! দ্বার বাহির হইতে বন্ধ ছিল; সুষমা ধীরে ধীরে দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। মন্দির অন্ধকারময়। অভাগিনী সেই তমিস্রা-মগ্ন মন্দিরের মধ্যে জনার্দ্দনের পদতলে বসিয়া পড়িল,—করযোড়ে কাতরকণ্ঠে বলিতে লাগিল, "নারায়ণ, আমাকে বাঁচাও—আমাকে রক্ষা কর। আমি যে নিজের শক্তিতে আর উঠিতে পারিতেছি না দেব! আমার ইহকাল ত গিয়াছে, পরকালও যে যায়! কোথায় তুমি দেব, আমাকে রক্ষা কর।" তাহার মুখ দিয়া আর কথা সরিল না। বিলুপ্ত-চেতনা, অভিভূতা অভাগিনী দেবতার পাদমূলে বিলুণ্ঠিতা হইতে লাগিল।

কতক্ষণ সে এ অবস্থায় ছিল, তাহা সে জানে না;—অকস্মাৎ কাহার কোমল করস্পর্শে তাহার জ্ঞানসঞ্চার হইল। তখন প্রভাত হইয়াছে, মুক্তদ্বারপথে বালার্ককিরণ মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে।

বাহিরে পাখীরা কলরব করিতেছে। দূরে গ্রামপ্রান্তে একজন বৈষ্ণব প্রাণ খুলিয়া গান ধরিয়াছে—

"কামরূপের ঘাটে নেমো না রে মন আমার!"

দূর হইতে এই সঙ্গীত সুষমার কর্ণে যেন দৈববাণীর ন্যায় ধ্বনিত হইল। তৎক্ষণাৎ সে চক্ষু চাহিয়া দেখিল,—শিয়রে গুরুপুত্র দণ্ডায়মান। সুষমা তখন বাঘিনীর ন্যায় লম্ফ দিয়া দাঁড়াইল; কেশপাশ আলুলায়িত, পরিধেয় বসন শ্লথবিন্যস্ত; কিন্তু সে দিকে তাহার দৃষ্টি নাই। তাহার দীপ্তনয়ন দিয়া যেন বহ্নিশিখা বিচ্ছুরিত হইতে লাগিল। দৃঢ়স্বরে বলিল,

"এখানে কি চাও তুমি ঠাকুর ?" সে সময়ে যদি মন্দিরের মধ্যে বজ্র-পতন হইত, তাহা হইলেও গোস্বামীপুত্র এমন ভীত হইত না। ঠাকুর দেখিল তাহার সম্মুখে অপূর্ব্ব দেবীপ্রতিমা—মাতৃমূর্ত্তি! কোথায় চলিয়া গেল তাহার বিলাস-লালসা—কোথায় পলায়ন করিল তাহার প্রেম-সম্ভাষণ! সবিস্ময়ে রুদ্ধবাক্ গোস্বামীপুত্র সুষমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সুষমা তখন আবার গর্জ্জিয়া বলিল, "গোঁসাই, তোমাকে ক্ষমা করিলাম। এই দণ্ডেই তুমি এখান হইতে চলিয়া যাও; নতুবা—" বাতাহতা বেতসের ন্যায় সুষমার অঙ্গ কম্পিত হইতেছিল।

গোঁসাই আর সেখানে দাঁড়াইতে সাহসী হইল না, একটি কথাও সে বলিতে পারিল না। তখনই মন্দির হইতে বাহির হইয়া গ্রামের সকলের অজ্ঞাতসারে কোথায় চলিয়া গেল; পরদিন আর কেহ তাহার খোঁজ পাইল না। যদু ভট্টাচার্য্য বৃন্দাবনে পত্র লিখিলেন—কিছুদিন পরে সংবাদ পাইলেন যে, গুরুপুত্র বৃন্দাবনে গিয়াছেন। তাঁহার এই অকস্মাৎ চলিয়া যাওয়ার কারণ কেহই জানিতে পারিল না।

আর এদিকে এই মহাসংগ্রামে বিজয়ী হইয়া সুষমার জ্যোতিঃ আরও যেন বাড়িয়া গেল—তাহার বাসনার অনল একেবারে নিভিয়া গেল। প্রাণে আর হাহাকার রহিল না। এই জ্বলন্ত অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তাহার প্রাণে যে আনন্দ হইয়াছিল—সমগ্র পৃথিবীর বিনিময়েও বুঝি তাহা দুর্লভ।

ক্ষুদিরাম

"দেখ্, ক্ষুদে, তোর যে বড় লম্বা লম্বা কথা আজ ক'দিনই শুনে আস্‌ছি। ছোটলোক চাকরের অত লম্বা কথা, অত নবাবি আমার বাড়ীতে খাট্‌বে না।"

আমার মনিব নলিন বাবুর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী ভারি মেজাজ গরম ক'রে এই কয়টি কথা অনায়াসে তা'র ঠাকুরদাদার বয়সী আমাকে শুনাইয়া দিল। আমার এই পঁয়ষট্টি বৎসর বয়সের মধ্যে এমন কথা কেউ কখন বলে নাই—বল্‌তে সাহসও পায় নাই! আমি অবাক্ হইয়া মা-লক্ষ্মীর মুখের দিকে একবার চাহিলাম—তাহার পর একটি কথাও না ব'লে সেখান থেকে বাহিরে চলে এলাম।

আমি ক্ষুদিরাম—রাজারামও নই, বাদসারামও নই। যখন নলিন বাবুর বাপের বয়স আমার সমান তখন বুড়ো কর্ত্তা আমাকে এই বাড়ীর চাকরীতে বহাল করেন—সে আজ পঞ্চাশ বৎসরের কথা। এই পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে এমন সাধ্য কারও বাপেরও হয় নাই যে, ক্ষুদিরামকে এমন কড়া কথা শুনিয়ে যায়। আজ আমার মনিবের দ্বিতীয় পক্ষের পরিবার অনায়াসে এমন কঠিন কথাগুলো আমাকে বলিলেন—আর আমি শ্রীক্ষুদিরাম ঘোষ একটা কথাও না ব'লে বেরিয়ে এলাম। হায় রে বয়স!

বাহিরের বৈঠকখানায় এসে মেঝের উপরই মাথায় হাত দিয়ে বসলাম। আমার মনে হ'তে লাগলো—আমার মাথায় বজ্রাঘাত হ'লেও এত কষ্ট—এত যাতনা হ'ত না। যে নলিন বাবুর বাপকে আমি বিয়ে

দিয়ে নিয়ে এসেছি—যে নলিন বাবু আঁতুর থেকে বেরিয়ে সকলের আগে এই ক্ষুদিরামের কোলে যায়গা পেয়েছিল—যে ক্ষুদিরামের শরীরের বিন্দু বিন্দু রক্ত দিয়ে ত্রিশ বছরের নলিন বাবু মানুষ হ'য়েছে—যে ক্ষুদিরামের লাঠির চোটে বুড়ো কর্ত্তা এ তালুক মুলুক করেছিলেন—নলিন বাবুর বাবা রাধামাধব বাবু যে ক্ষুদিরামকে 'ক্ষুদে দাদা' ছাড়া কখনও আর কিছু ব'লে ডাকেন নাই, যে নলিন বাবু এত লেখাপড়া শিখেও আজও আমাকে 'ক্ষুদে জ্যাঠা' ব'লে ডাকে—সেই নলিন বাবুর বৌ কি না আমায় বলে—'ওরে ক্ষুদে, তোর ত বড় লম্বা লম্বা কথা।"

কত কথাই মনে হ'তে লাগলো। পঞ্চাশ বছরের কথা কি কম কথা। আমি যে নিজের হাতে সর্ব্বেশ্বর বোসের সংসার পেতে দিয়েছি—আমি যে নিজের হাতে তাঁর ছেলে রাধামাধব বোসের এই কোঠার প্রথম ইঁট পুঁতেছি—আমিই যে লাঠিবাজী ক'রে, কত অত্যাচার ক'রে বোসেদের এই তালুক-মুলুক ক'রে দিয়েছি ;—বড়াই কচ্ছি না—বাড়িয়ে বলছি না—সত্যি সত্যি এই ক্ষুদিরাম ঘোষের লাঠির জোরেই বোসেদের তালুক-মুলুক, সে কথা কে না জানে। আর আজ কি না কোথাকার কে—কোন্ গাঁয়ের এক ছোটলোকের মেয়ে তিনদিনের গিন্নী হ'য়ে আমায় বলে 'ওরে ক্ষুদে।'

একবার মনে হলো, দূর ছাই, এ সংসার ছেড়ে চলে যাই ; কিন্তু কথাটা মনে কর্ত্তেই বুকের ভিতর কেমন ক'রলো। পঞ্চাশ বছরের সম্বন্ধ কি এক কথায় ভোলা যায়। তারপর,—তারপর—ঐ যে বাড়ীর ভিতর আমার দাদা বাবু—এই নলিন বাবুর বাপ রাধামাধব বাবু—এ আগুনের কুণ্ড জ্বেলে রেখে গিয়েছেন—তার কি হবে—তার দশা কি হবে? রাধামাধব বাবু কত সাধ আহ্লাদ ক'রে একমাত্র মেয়ে মানদার বিয়ে দিয়েছিলেন—আমি ক্ষুদিরাম দুই হাতে টাকা খরচ ক'রেছিলাম।

আর ছ'মাস যেতে না যেতেই সব ফুরিয়ে গেল। তারপর সেই রাধামাধব বাবুর শেষদিনের কথা,—যখন একদিকে যম টান্ছে—আর একদিকে আমি ক্ষুদিরাম শরীরের সকল শক্তি দিয়ে টান্ছি, সেই সময়, সেই অন্তিমকালে রাধামাধব বাবু ত আর কাউকেই কিছু বলেন নাই—আমাকেই শুধু বলে গেলেন "ক্ষুদে দাদা, তোরই মেয়ে, তোরই হাতে দিয়ে গেলাম।" কোথাকার এক ছোটলোকের মেয়ের কথা শুনে কি সে সব ভুলে যাব। তা কিছুতেই হ'তে পারে না—বোসেদের অন্ন খেয়ে ক্ষুদিরাম এ নিমক্হারামি কর্তে পারবে না। কিন্তু কথাগুলো বড়ই অসহ্য বোধ হচ্ছে। দেখ্লে আস্পর্দ্ধা, আমাকে বলে 'ওরে ক্ষুদে, লম্বা লম্বা কথা।'—আমাকে শুনায় "আমার বাড়ী।" বাড়ী তার, আর পঁয়ষট্টি বছরের বুড়ো ক্ষুদিরাম এ বাড়ীর কেউ নয়? আমি কিছুতেই রাগ সামলাতে পাচ্ছি না। কিন্তু রাগের মাথায় যদি একটা কিছু ক'রেই বসি—যদি চোলেই যাই—তা হলে মানসীর কি হবে। আজ যে বজ্র আমার উপর পড়লো, দুদিন যেতে না যেতেই সেই বজ্র মানসীর উপর পড়বে;—তখন—তখন, সাবধান ক্ষুদিরাম—তখন সাবধান বোসেদের তিন পুরুষের চাকর—সেই বজ্র বুক পেতে নিও। সে দিন বোসেদের এই সংসারে আগুন লাগিয়ে দিয়ে—মানসীকে নিয়ে আমি কাশীবাসী হব। সেই পর্য্যন্ত ধৈর্য্য ধ'রে থাক্তেই হবে।

(২)

ষোলবৎসর বয়সে এই বোসেদের বাড়ী এসেছি—আর এখন আমার বয়স পঁয়ষট্টি বছর। প্রথম যখন আসি—তখন বাড়ীর কর্ত্তা সর্ব্বেশ্বর বোস। তখন কি আর এ অবস্থা ছিল। এই হরিহরপুরের বোসেদের কি তখন কেউ চিন্ত?—গরীব সর্ব্বেশ্বর বোস কল্মিগঞ্জের হাবি

সাহেবের নীলকুঠির সামান্য একজন কারপরদাজ ছিলেন। বাড়ীতে ছিলেন তাঁর স্ত্রী, আর এক বুড়ামাসী; সন্তানের মধ্যে একই পুত্র রাধা-মাধব। তখন কি আর এ কোঠা-বালাখানা ছিল। যেখানে এখন অন্দরবাড়ী হয়েছে, সেখানে একখানি রান্নাঘর আর সেই রান্নাঘরেরই এক পাশে একটা ঢেঁকি। তারই পাশে একখানি পূর্ব্বদুয়ারী আর এক-খানি দক্ষিণ-দুয়ারী ঘর। বাইরে ব'সবার ঘরও ছিল না।—চারিদিকে জঙ্গল।

আমার সংসারে ছিল এক বুড়ী ঠাকুরমা—আর কেউ ছিল না। একদিন নদীর ঘাটে গিয়ে ঠাকুরমা জলে ডুবে মরে গেল। জমিজমাও ছিল না—কারকারবারও ছিল না। বুড়ী ঠাকুরমা শ্যাম শান্যালের বাড়ী দাসীগিরি কোরত, আর আমি গয়লার ছেলে কি না—শান্যালদের গরু রাখ্‌তাম। ঠাকুরমা যখন মরে গেলেন, তখন মনে হঁলো, দূর ছাই বামুনবাড়ীর রাখালি আর করবই না। শান্যাল বাড়ীর মাঠাকুরুণের কাছে সেই কথা বল্‌লাম। তিনি বল্‌লেন, "ক্ষুদিরাম, ক্ষুদিরাম, অমন কর্ম্ম করো না; বাপ বড়বাপের গাঁ কি ছেড়ে যেতে আছে। তা তোর রাখালি কর্ত্তে মন না লাগে, অমনিই আমাদের বাড়ী থাক্। আমার যেমন দশটা ছেলেপিলে আছে, তুই ও তেমনি থাক্‌বি। দেশ ছেড়ে কোথায় যাবি। এতটুকু বেলায় তোর মা মরে গেলে বুড়ী তোকে কোলে ক'রে কাঁদতে কাঁদতে আমাদের বাড়ী এলো। কর্ত্তা তোর বরাদ্দ ক'রে দিলেন, তোর শোবার জন্যে বড় খোকার ভাল কাঁথাখানি পর্য্যন্ত দিলাম। তোকে কি কোন অযত্ন করিছি। না বাছা, বিদেশে যাস্‌নি। এই বাড়ীই তোর বাড়ী।"

বামুনগিন্নীর এত ভালবাসার কথা তখন কাণে তুল্‌লাম না, গোয়ালার ছেলে—ষোলবছর বয়স—শরীরে অসুরের মতন বল। ম

করলাম করিমগঞ্জের কুঠিতে যদি যাই, তা'হলে এই জোয়ান চেহারা দেখে হারবি সাহেব বাবা ব'লে চাকরী দেবে। চাই কি, দুচার বছরের মধ্যে একটা মানুষের মতন মানুষই হ'য়ে যাব। তাই বামুনমায়ের নিষেধ শুনলাম না। কাউকে কিছু না ব'লে একদিন শেষরাত্রে এক গামছা আর এক কাঁচাবাঁশের লাঠি—এই নিয়ে করিমগঞ্জে গেলাম। কুঠির নায়েব কৃপানাথ চক্রবর্ত্তী তাঁ'র বাসায় আমায় রাখ্‌লেন। সর্ব্বেশ্বর বোসও সেই বাসায় থাক্‌তেন। কুঠির পাইক বরকন্দাজদের রকম সকম আমার বড় ভাল লাগলো না। আর হারবি সাহেবের শ্যামচাঁদ—সে কথা মনে করলেও আমার গা শিউরে উঠে। তখন মনে কর্‌লাম, থাক্‌ আমার চাক্‌রী—থাক্‌ আমার বড়মানুষ হওয়া—গাঁয়ে ফিরে গিয়ে শ্যাম শাণ্ডালের রাখালিই করিগে। কিন্তু লজ্জা হলো;—যাঁদের কথা ঠেলে চলে এসেছি—তাঁদের কাছে আবার কেমন ক'রে যাই। কাজেই আর গ্রামে ফেরা হোলো না।

এমন সময় একদিন শেষ বেলায় সর্ব্বেশ্বর বাবু বল্‌লেন, "ক্ষুদিরাম, তুমি ত বোসেই আছ; আমার যদি একটা কাজ কোরে দিতে। আমি চার আনার ধান কিনে রেখেচি, এই ধানের বস্তাটা যদি আমার বাড়ীতে নিয়ে যেতে; আমিও সঙ্গে যাব। আড়াই ক্রোশ রাস্তা বই ত নয়। আজ রাত্রি আমার বাড়ীতেই থেকো, কাল সকালে চোলে এসো।" বোস মশায়ের কথা অস্বীকার কোরতে পারলাম না। তাঁর সঙ্গে হরিহরপুরে এলাম। আজও এলাম—কা'লও এলাম। সর্ব্বেশ্বর বাবুর স্ত্রীর মত মানুষ মাটী দিয়ে গড়ালেও হয় না; যেমন মা ভগবতীর মত রূপ, তেমনই দয়া, আর কথাগুলো যেন মধুমাখা। আমি সামান্য গোয়ালার ছেলে; কোন দিন জানাশুনা নাই—কিন্তু কর্ত্তা-মা আমার যে রকম আদর কোরতে লাগলেন, তাতে আমি একেবারে গোলে গেলাম। পর

দিন বোস মশাই বোল্লেন, তাঁর বাড়ীতে লোকজন নাই, রাধামাধব ছেলে-মানুষ, আমি যদি তাঁদের বাড়ীতে থাকি তা হোলে তাঁদের বড়ই উপকার হয়। তাঁরা বেশী মাইনে দিতে পারবেন না—অবস্থা ত ভাল নয়। আমি ভাবলাম, আমার টাকাকড়ির এখন দরকারই বা কি—এত আদর যত্ন কোথায় পাব! আমি তখনই স্বীকার কোরলেম্। সেই থেকে আমি হরিহরপুরের বোসেদের বাড়ী আছি। অল্প দিনের মধ্যেই এমন হোয়ে গেল যে, আমি যে পরের বাড়ীতে আছি—আমি যে বাড়ীর চাকর, তা আমার মোটেই মনে হতো না। রাধামাধব আমার সমান বয়সী, আমি তাকে দাদাবাবু বোলে ডাকতাম।

তারপর রাধামাধব বাবুর বিয়ে হোলো; আমিই সারা পথ লাঠি কাঁধে কোরে পাল্‌কীর সঙ্গে গেলাম,—আমিই দাদা বাবুর স্ত্রীকে ঘরে তুল্‌লাম। তারপর আমিই কর্ত্তা গিন্নীকে একে একে শ্মশানে রেখে এলাম। আমারই পরামর্শে রাধামাধববাবু কুঠীর চাকরী নিলেন—আমারই পরামর্শে—আমারই বুদ্ধিতে, রাধামাধব ক্রমে কুটীর দেওয়ান হোলেন—আমারই চেষ্টায় তালুক মুলুক হোলো—হরিহরপুরের বোসেরা দশজনের একজন হোলো। এখন রাধামাধব বাবুও স্বর্গে—বৌমাও স্বর্গে। যারা অনেক দিন থাক্‌বে বোলে এসেছিল—তারা সবাই আগে আগে চোলে গেল; আর আমি এই সব কষ্ট ভোগ করবার জন্য এই বুড়ো বয়স পর্য্যন্ত বোসেদের বাড়ী আগ্‌লে বোসে আছি। আরও কতদিন থাকতে হবে কে জানে!

নলিন বাবুর জন্ম দেখ্‌লাম, কোলে পিঠে কোরে মানুষ কর্‌লাম—ক্ষুদে জেঠা না হোলে চোল্‌তো না—আমার হাতে না খেলে তার পেট ভরত না—আমার কাছে না শুলে তার ঘুম হোতো না। বোসেদের সোণার সংসারই আমার সংসার—আমি বিবাহও করিলাম না—গৃহস্থও হ'লাম না।

নলিন লেখাপড়া শিখ্‌লেন—কোলকেতায় পোড়তে গেলেন—আমি সঙ্গে গেলাম। আমার মনে হোতো আমি না হোলে বুঝি তার চলে না। তারপর আর বেশী দিন কোল্‌কেতায় থাকা হোলো না। বাড়ীতে সর্ব্বনাশ হোয়ে গেল—আমার বড় সাধের মানসীর সিঁথির সিন্দূর ঘুচিয়া গেল। মা আমার মলিন হোয়ে গেল। তখন এই ক্ষুদে জেঠাই তার একমাত্র জুড়াবার যায়গা হোলো। রাধামাধব বাবু আর তাঁর স্ত্রী স্বর্গে গেলেন,—কত সাধ আহ্লাদ কোরে নলিনের বিয়ে দিয়ে বউ ঘরে আন্‌লাম। সে লক্ষ্মীও চোলে গেলেন—প্রথম সন্তান হওয়ার সময়ই তাঁর প্রাণ গেল। নলিন কিছুতেই বিয়ে কোরতে চায় না। আমিই কত বোলে, কত উপদেশ দিয়ে তবে তার আবার বিয়ে দিলাম। কিন্তু এখন মনে হোচ্চে, বড়মানুষের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে না দিলেই ভাল হোতো। আজ তিন বছর নলিনের বিয়ে হোয়েছে, এই তিন বছরের মধ্যে একবার মাত্র একমাসের জন্য এই বউ বাড়ীতে এসেছিল—তার এ পাড়াগাঁয়ে থাক্‌তে ইচ্ছা করে না। নলিন তাই কোলকেতাতেই অনেক সময় থাকে। টাকার ত অভাব নাই। আমি আমার এই শরীরের রক্ত জল কোরে যা গুছিয়েছি, তাতে নলিনের সংসার বেশ চোলে যায়—পরের চাকুরী আর কোর্‌তে হয় না। নলিন যে বারমাসই কোল্‌কেতায় থাক্‌বে,—এ কথাটা আমার একেবারেই ভাল লাগলো না। তাই অনেক বলাবলির পর নলিন বৌ নিয়ে বাড়ী এসেছেন। সেই নলিনের বৌ এখন আমাকে বলে কি না "ওরে ক্ষুদে!"

নলিনের বৌ যে আমাকে এই অপমান কোর্‌লো, সে কথাটা নলিনের কাণে তুল্‌বো কি না, এই কথা অনেকক্ষণ ভাব্‌তে লাগলাম। একবার মনে হোলো, কাজ নেই কথাটা বোলে। নলিন কি মনে

কোরবে—কি জানি দ্বিতীয় পক্ষের পরিবার। কিন্তু আবার মনে হোলো, এই সময়েই যদি শিক্ষা না দেওয়া যায়, তা হোলে এমন আস্পর্দ্ধা বেড়ে যাবে—আমাকেও হয় ত—এর চাইতে আরও কঠিন কথা বোলবে;—তারপর আমাকে ছেড়ে হয় ত মানসীর উপরও গিন্নিগিরি খাটাতে যাবে। না না—তা কিছুতেই হবে না। আজই নলিনকে সব কথা শুনিয়ে দিতে হবে;—যে সকল কথা বলবার কোন দিন দরকার হয় নাই—আজ—ঐ পরের বেটীর সাম্‌নে দাঁড়িয়ে নলিনকে সেই সব কথা শুনিয়ে দেব—দেখবো সে এই ৬৫ বছরের ক্ষুদে জেঠার কথা শুনে কি বলে? হারবি সাহেবের এত বড় কান্‌সারণ যে এই ক্ষুদিরামের ঐ পাকা বাঁশের লাঠির জোরে উড়ে গিয়েছিল—আর নবীনগরের তালুকখানি বোসেদের হাতে এসেছিল—সে কেমন ক'রে, তা ত নলিন বাবু জানে না। এই দেখ, এখনও আমার পিঠে তলোয়ারের চোট রোয়েছে। এতদিন এ সব কথা বলি নাই—আজ নলিন বেড়াইয়া আসিলে সব কথা বলিয়া বুঝিয়া লইব। তারপর যা হয় হবে।

(৩)

ক্ষুদিরামের জীবনের দু একটি কথা আমি বলিব। আমার নাম শ্রীনলিনবিহারী বসু। সেদিন বাড়ীতে আসিয়াই দেখি, ক্ষুদিরাম—আমার ক্ষুদে জ্যাঠা—অতি বিষণ্ণ বদনে ভূমিতলে বসিয়া আছে। এই পৃথিবীতে সকলের বিষণ্ণতা আমি সহ্য করিতে পারি—কিন্তু আমার ক্ষুদে জ্যাঠা বিষণ্ণ হইলে—মুখ ভার করিলে, আমি সত্যসত্য চারিদিক অন্ধকার দেখি। ক্ষুদে জ্যাঠা যে আমাকে খোকা বা বলিয়া ডাকে, সে ডাক অতি ঠিক—এ সংসারে আমি সত্যসত্য

খোকা। বয়স ত্রিশ বৎসর হইয়াছে, কিন্তু এখনও সেই বৎসরের বুড়া ক্ষুদে জ্যাঠার স্কন্ধে ভর দিয়া আমি এই সংসারক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছি। এই যে আমার তালুক—এই যে আমার জোতজমা—ইহার কোন সংবাদই আমি রাখি না। ক্ষুদে জ্যাঠা আমার সব—আমার সর্ব্বস্ব। শুনিয়াছি, জন্মিয়াই ক্ষুদে জ্যাঠার কোলে আশ্রয় পাইয়াছিলাম—সে আশ্রয় আমি আজও ছাড়ি নাই, আমার ছাড়িবার সাধ্য নাই। সে বুড়া হইয়াছে, হয় ত কবে মরিয়া যাইবে—এ কথা যখনই আমি ভাবি, তখনই চারিদিক অন্ধকার দেখি; আর ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, ক্ষুদে জ্যাঠাকে এই বুড়া বয়সেও ভবসমুদ্রের এ পারে বসাইয়া রাখিয়া আমি যেন পাড়ি দিয়া চলিয়া যাই।

আমার সেই বাল্যের খেলার সাথী, কৈশোরের বন্ধু, যৌবনের অবলম্বন-দণ্ড ক্ষুদে জ্যাঠাকে সেদিন ঐ অবস্থায় দেখিয়া আমার বড়ই কষ্ট হইল;—বেশ বুঝিতে পারিলাম তুচ্ছ কোন কারণে ক্ষুদে জ্যাঠা এত বিষণ্ণ হয় নাই। আমার সেই ছেলেবেলাকার অভ্যাস-মত—আমি শ্রীনলিনবিহারী বসু, আমি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিধারী যুবক—নিতান্ত শিশুর মত সেই গৃহতলে ক্ষুদে জ্যাঠার কোলের কাছে বসিয়া পড়িলাম,—আর সেই বৃদ্ধ নিতান্ত শিশুর মত, তাহার সেই অভয় বক্ষের মধ্যে আমাকে সাপটিয়া ধরিল, তাহার দুই চক্ষু দিয়া তাহার হৃদয়ের অব্যক্ত বেদনা অশ্রুপ্রবাহে বাহির হইতে লাগিল। আমার সাহস হইল না—আমার সাধ্য হইল না, ক্ষুদে জ্যাঠাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করি।

অনেকক্ষণ নিস্তব্ধভাবে বসিয়া থাকিয়া আমি ধীরে ধীরে তাহার মুখের দিকে চাহিলাম; দেখিলাম—মুখ গম্ভীর বটে, কিন্তু তাহারই মধ্য হইতে অপরিমেয় পুত্রস্নেহ শতধারায় উচ্ছ্বসিত হইয়া আমাকে

অভিষিক্ত করিতেছে। আমার মনে সাহস হইল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"কি হ'য়েছে ক্ষুদে জ্যাঠা।"

সে অতি ব্যস্তে ত্রস্তে বলিল—"না না, কই কিছু হয় নি। বুড়া হ'য়েছি, কবে ম'রে যাব। তাই এক-এক সময় যখন মনে হয় যে আমার গণা দিন ফুরিয়ে এসেছে, তখন প্রাণটা কেমন কাঁদিয়া উঠে—চখের জল রাখ্‌তে পারিনে। বোসেদের এই সুখের সংসার, তুমি আর মানসী, এদের ছেড়ে কোন্ এক অচেনা দেশে যেতে হ'বে, তাই মনে করে বড় কাতর হ'য়ে পড়ি।"

আমি বলিলাম "তা' নয় ক্ষুদে জ্যাঠা, তুমি আমার কাছে লুকোচ্ছ। বুদ্ধি হয়ে অবধি তোমায় দেখে আসছি; কাকে তুমি ভুলোচ্ছ। তুমি যদি সব কথা খুলে না বল, তাহ'লে তোমার সঙ্গে এমন আড়ি হবে যে তিন মাসেও তা' ভাঙ্‌বে না। জান ত একবার কলকতায় তোমার সঙ্গে আড়ি ক'রে আমি একদিন কথা বলি নাই।"

ক্ষুদে জ্যাঠা আর থাকিতে পারিল না। বুড়া এমন হাসিয়া উঠিল যে, তাহার হাসির চোটে ঘর ফাটিয়া যাইতে লাগিল। আমি বুঝিলাম আজকের যুদ্ধে আমার জয়—ক্ষুদে জ্যাঠার পরাজয়। এমন জয়-পরাজয় আমাদের অনেক দিন হইয়াছে।

আমি তখন প্রফুল্ল বদনে বস্ত্রাদি ত্যাগ করিবার জন্য আমার শয়ন-গৃহে প্রবেশ করিলাম। আমি জানিতাম না, বৈঠকখানা গৃহে যখন আমাদের এই পবিত্র দৃশ্যের অভিনয় হইতেছিল, তখন দ্বারের অন্তরাল হইতে আমার দ্বিতীয় পক্ষের সহধর্ম্মিণী—আমার ডেপুটী শ্বশুরের অশেষ গুণসম্পন্না দুহিতা—এই দৃশ্য দেখিতেছিলেন। আমি গৃহে প্রবেশ করিবামাত্রই তিনি কতক ঘৃণা, কতক তাচ্ছিল্য, আর ততোধিক রহস্য-মিশ্রিত স্বরে বলিয়া উঠিলেন—"কি সাতপুরুষের বাপের ঠাকুর

নিয়ে কি হচ্ছিল”—সেই মুহূর্ত্তে ঘরের মধ্য হইতে কালসর্প যদি আমাকে দংশন করিত, সেই মুহূর্ত্তে আমার সম্মুখে যদি বজ্রপাত হইত, তাহা হইলেও আমি এতদূর স্তম্ভিত হইতাম না। চাহিয়া দেখিলাম, আমার সম্মুখে আমার দ্বিতীয় পক্ষের পরিবার;—মুখে ঘৃণা, তাচ্ছিল্য ও রহস্য প্রকটিত হইয়াছে। আর সে মুখের দিকে চাহিতে ইচ্ছা হইল না। তাহার মুখের কয়েকটা কথাতেই তাহার লাবণ্য, তাহার যৌবন, তাহার ডেপুটী পিতা আমার দৃষ্টির উপর দিয়া ছায়ার ন্যায় সরিয়া গেল;—আমি দেখিলাম, আমার শয়ন-গৃহের মধ্যে কোথা হইতে এক রাক্ষসী প্রবেশ-লাভ করিয়াছে। তাহার প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হইতে নরকের পূতিগন্ধ বাহির হইতেছে।

এমন অন্যায়, অশিষ্ট, অভদ্রোচিত কথার উত্তর দিতেও আমার ঘৃণা বোধ হইল। সেখানে দাঁড়াইয়া থাকিলেও আমার শরীর কলুষিত হইবে বলিয়া মনে হইল। কিন্তু এ কথাও গোপন করিতে পারিতেছি না যে, রাগে আমার সর্ব্বশরীর কাঁপিয়া উঠিয়াছিল,—আমার পূজনীয় পিতৃপিতামহগণকে যে এমন তাচ্ছিল্যভাবে উল্লেখ করিতে পারে, তাহার উপর মরা মানুষেরও রাগ হয়—আমি ত ত্রিশ বৎসরের যুবক।

ভগবানের কৃপায় সে সময়ে আমি রাগ সংবরণ করিতে পারিয়াছিলাম। একটি কথাও না বলিয়া আমি ঘর হইতে বাহির হইবার উপক্রম করিতেছি, এমন সময় ক্ষুদিরাম ধীর-পদবিক্ষেপে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল এবং বাম হস্তে আমার দক্ষিণ হস্ত দৃঢ়ভাবে ধরিয়া বলিল—“যেও না খোকা বাবু! যে কথার জবাব তুমি দিতে পারলে না, সে কথার জবাব আমি দিচ্ছি। দেখ, মা-লক্ষ্মি, খোকা বাবু ছেলে-মানুষ,—সে তোমার কথার কি জবাব দেবে—কতটুকুই বা সে জানে। কথাটা আমাকে জিজ্ঞাসা কর। কি বলছিলে—চোদ্দ পুরুষের ঠাকুর—

চৌদ্দ পুরুষের নয়, তিন পুরুষের। আমি বোসেদের তিন পুরুষের ঠাকুর। গয়লার ছেলে ক্ষুদিরাম, বোসেদের তিন পুরুষের অন্ন খেয়ে আস্‌ছে।"

ক্ষুদিরামের কথায় বাধা দিয়া আমার স্ত্রী বলিলেন, "কে তোকে এখানে ডাক্‌লে। কার সম্মুখে কথা বল্‌ছিস্ জানিস্।"

"হা অদৃষ্ট, এই বুড়া বয়সে নাতিনীর বয়সী মেয়েমানুষের সঙ্গেও কোঁদল কর্ত্তে হলো। মা-লক্ষ্মী, দুটো কথারই জবাব দিব কি? তোমার কথার জবাব দিচ্ছি,—আমাকে আবার ডাক্‌বে কে? এ যে আমার পঞ্চাশ বছরের বাড়ী—আজ দুই বছর হলো তোমাকেই আমি ডেকে এনেছি। লক্ষ্মি, ক্ষমা করো, তোমার শেষের কথাটার জবাব কিছু কড়া হবে। কার সুমুখে কথা বলছি, তা জানি। হারবি সাহেব একটা বুনো মাগীকে মেম করে রেখেছিল; তারই হাত-পা জড়িয়ে ধরে সাহেব দিয়ে সুপারিস করে যে ডেপুটী হ'য়েছে—সেই রাজকৃষ্ণ মিত্রের মেয়ের সঙ্গে কথা বলছি। আরও কিছু শুনতে চাও।" আমি ত অবাক্। কি বলিব, কাহাকে থামাইব, ভাবিয়া পাইলাম না। তখন নিরাভরণা একটি বিধবা বালিকা আসিয়া ধীরে ধীরে বলিল—"জ্যাঠা, তুমি কি পাগল হ'লে। এস, আমার সঙ্গে এস, পায়ে পড়ি বউ, ক্ষমা কর।" তখন সুপ্ত সিংহ যেমন গর্জ্জিয়া উঠে, তেমনই গর্জ্জিয়া ক্ষুদিরাম বলিল,—"আজ ক্ষমা নাই মা, আজ বোসেদের তিনপুরুষের ভাতের হিসাব-নিকাশ ক'রে এখান থেকে বেরিয়ে যাব, আর এ মুখো হব না। শোন বৌমা, শোন খোকা বাবু, সর্ব্বেশ্বর বোসের সংসার আমি পেতেছিলাম। একদিনের কথা শোন,—যেদিন স্বরূপগঞ্জের মাঠে হারবি সাহেব, দেওয়ান রাধামাধব বোসকে সকলের সম্মুখে যাচ্ছে-তাই ব'লে গালাগালি দিয়েছিল, সেই দিনের কথাটা বলি। নীলকুঠীর সাহেবের মুখে ভালমন্দ বাধে না। যাকে-তাকে, যা তা ব'লে গালাগালি দেয়। সে রাধামাধব

বোসকেও যখন অতি খারাপ কথা ব'লে গালাগালি দিতে আরম্ভ কর্‌ল, আমার তখন রাগে শরীর জ্বলে উঠ্‌লো। আমি বল্‌লাম—'সাবধান সাহেব, মুখ সাম্‌লে কথা বলো।' সাহেব আমাকে মার্‌তে এলো। আমি তখন তাহার বেত কেড়ে নিয়ে তাকে ঘোড়া থেকে টেনে নামিয়ে খুব ঘা-কতক বসিয়ে দিলাম। তারপর, দাদাবাবুর হাত ধ'রে টেনে নিয়ে বাড়ী এলাম। সাহেব রাধামাধব বোসের আর ক্ষুদিরামের মাথা কেটে আনবার হুকুম দিল। রাধামাধব বোসের পরিবারকে বে-ইজ্জত করবার হুকুম দিল। সে দিন এ বাড়ী কে বাঁচিয়েছিল, জান মা লক্ষ্মি। আমি ক্ষুদিরাম ঘোষ, আমারই লাঠির চোটে সে দিন রাধামাধব বোসের মান-ইজ্জত বেঁচেছিল। একেলা আমি দাঁড়িয়ে একখানি বাঁশের লাঠি হাতে নিয়ে কুঠীর পঞ্চাশ জন লোকের মোহারা নিয়েছিলাম—সাতজনকে জখম করেছিলাম। তার পর সেই সাহেব যখন ঘুমে অচেতন, তখন আমিই বাছা-বাছা সাগরেদ নিয়ে সাহেবের কুঠী চড়াও করি। আর রাধামাধব বোসের অপমানের স্থদশুদ্ধ ফিরিয়ে দিই। তার পরেই হারবি সাহেব তাহার যথাসর্ব্বস্ব রাধামাধব বোসের কাছে বিক্রী করে দেশে চলে যায়। বুঝলে আমি কে? বড়াই কচ্ছি না, এ বোসের সংসার—আমার সংসার। এ বাড়ীর আমিই কর্ত্তা। আজ কি সেই পঞ্চাশ বৎসরের কর্ত্তাগিরি এক কথায় ছেড়ে দিয়ে যেতে পারি? তাই অনেক দিন পরে একদিনের একটা কথা বলে নিলাম। কিছু মনে করো না, মা লক্ষ্মী,—কিছু মনে করো না খোকা বাবু। পঁয়ষট্টি বৎসরের বুড়ো ক্ষুদিরাম আজ মানসীকে নিয়ে এ বাড়ী থেকে চলে যাবে। আর না, আর এখানে দাঁড়াব না; যে বাড়ীতে ক্ষুদিরামের স্থান হ'লো না—সে বাড়ীতে তোরও স্থান হবে না মানসী—চল্‌—দুজনে বাবা বিশ্বনাথের দুয়ারে পড়ে থাকি গিয়ে।"

এই বলিয়া আমার দুঃখিনী ভগিনী মানসীর হাত ধ'রে, আমার জীবনের অবলম্বন, আমার সংসারের যথাসর্ব্বস্ব—ক্ষুদিরাম জ্যাঠা বাহির হইবার উদ্যোগ করিল। তখন আর আমি স্থির থাকিতে পারিলাম না; হৃদয়ের সমস্ত শক্তি মুখে আনিয়া বলিলাম—"সে হ'তেই পারে না, ক্ষুদে জ্যাঠা, কোথায় যাবে তুমি। কার উপর রাগ ক'রে তুমি যাচ্ছ। ধর্ম্মাধর্ম্ম জানিনে, পাপপুণ্য মানি না, ন্যায় অন্যায় বুঝি না; বুদ্ধি হয়ে তোমায় দেখেছি, তোমার বুকে মাথা রেখে স্বর্গসুখ ভোগ করেছি, তোমার শেষ কি আমার শেষ পর্য্যন্ত ছাড়াছাড়ি নাই। চল, বাহিরে যাই। এ অপবিত্র ঘরে আর দাঁড়িয়ে কাজ নাই।"

সেই দিনই হুগলিতে টেলিগ্রাম করিলাম। পরদিনই আমার সম্বন্ধী আসিয়া আমার স্ত্রীকে লইয়া গেল। প্রতিজ্ঞা করিলাম এ জীবনে আর তাহাকে এ বাড়ীতে আনিব না।

(৪)

ক্ষুদিরামের এই ক্ষুদ্র কথার উপসংহার আমাদেরই করিতে হইতেছে। স্ত্রীকে পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিয়া নলিন বাবু একেবারে আর এক মানুষ হইয়া গেলেন। এতদিন বাড়ী ঘর দুয়ার বিষয় সমস্ত ক্ষুদিরামই দেখিত, এখন তিনি নিজে সমস্ত দেখিতে লাগিলেন। বোধ হয় পাছে কেহ মনে করে, তিনি সংসার-কার্য্যে উদাসীন হইয়াছেন, তাই তিনি বিশেষ পরিশ্রমে সমস্ত ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। যাহাতে তালুকে উন্নতি হয়, তাহার বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। ক্ষুদিরাম কিছু বলিলে, বলিতেন—"ক্ষুদে জ্যাঠা, এত কাল ত আমাদের বোঝাই বহিলে, এখন এ সব জঞ্জাল আমি বই, তুমি একটু ধর্ম্মচিন্তা কর।" ক্ষুদিরাম সে কথার উত্তরে বলিত "আমার ধর্ম্মকর্ম্ম সবই তোমরা।

আজ পঞ্চাশ বছর তোমরাই আমার ধর্ম্ম ছিলে, আজও তাই থাকিবে।" নলিন সে কথা বুঝিতেন, তবুও যথাসম্ভব বুড়াকে কোন কাজ করিতে দিতেন না।

ওদিকে মানসী দিনে দিনে কেমন হইয়া যাইতে লাগিল ; সংসারে তার মন লাগে না ; কাকে লইয়া সে সংসার করিবে। আপনার সুখ-দুঃখ অতল জলে ভাসাইয়া দিয়া ভাইয়ের সুখ-দুঃখকেই সে জীবনের কার্য্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল। এখন দেখিল, তাহার দাদা সংসারী হইয়াও সন্ন্যাসী—স্ত্রী থাকিতেও গৃহশূন্য। তাহার প্রাণের কোন আশাই কি ভগবান পূর্ণ করিবেন না। দিবানিশি সে এই কথাই ভাবিত। কি করিলে দাদার সংসারে সুখের আবির্ভাব হয়, তাহা সে ভাবিয়া পাইত না। এক একবার মনে করিত, বউকে আবার বাড়ীতে আনি ; কিন্তু একদিন দাদার নিকট সে প্রস্তাব করিয়া সে কোনও উত্তর পায় নাই ; দাদার গম্ভীর মুখ দেখিয়া সে আর সাহস করিয়া দ্বিতীয়বার সে কথা তুলিতে পারে নাই ; অথচ তাহার ইচ্ছা হইত, আবার বউ বাড়ীতে ফিরিয়া আসে।

এমনই ভাবে এক বৎসর কাটিয়া গেল। বড়মানুষের মেয়ে ডেপুটীর কন্যা অনেক দিন কোন কথাই জানাইল না। শেষে তাহার বাপের বাড়ীতেও যখন গঞ্জনা আরম্ভ হইল, সকলেই তাহাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করিতে লাগিল, তখন সে বুঝিতে পারিল, সে কি অন্যায় করিয়াছে। তাহার যেখানে দাবী চলে, সে স্থানে তাহার আর যাইবার যো নাই। তখন ধীরে ধীরে সে বুঝিল স্বামী কি রত্ন, স্বামীর গৃহ কি দেব-নিকেতন!

প্রথম প্রথম সে এই সকল কথাই ভাবিত ; শেষে এ অবস্থা আর তাহার সহ্য হইল না। স্বামীকে পত্র লিখিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করাও

তাহার নিকট অসাধ্য বোধ হইল। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া সে মানসীকে এক পত্র লিখিল, সে পত্রে করযোড়ে ক্ষুদিরামের নিকট ক্ষমা-ভিক্ষা করিল। মানসী যখন সেই পত্রখানি ক্ষুদিরামকে পড়িয়া শুনাইল, তখন বৃদ্ধ ক্ষুদিরামের চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল, তাহার মনে বড়ই কষ্ট হইতে লাগিল। তাহার পর মানসীর সহিত পরামর্শ করিয়া সে হুগলী-যাত্রার আয়োজন করিল। নলিন যখন শুনিলেন যে, ক্ষুদিরাম হুগলী যাইতেছে, তখন তিনি মহা ক্রুদ্ধ হইলেন; বলিলেন, "জ্যাঠা মহাশয়, এমন কর্ম্ম তুমি করিতে পারিবে না—কিছুতেই না।" ক্ষুদিরাম বলিল, "খোকা বাবু, এতকাল তোমার অনেক অন্যায় আব্দার সয়েছি; কিন্তু এ কথা রাখতে পারবো না। ঢের হোয়েছে। আমারও যাবার সময় হোয়েছে; বুড়োকে সুখে মরিতে দাও।" নলিন বাবু রাগ করিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন, ক্ষুদিরাম চলিয়া গেল।

তিন দিন পরেই একখানি পাল্কী আসিয়া বাড়ীতে উপস্থিত হইল। মানসী তাড়াতাড়ি গিয়া বৌয়ের হাত ধরিয়া তুলিয়া আনিল—কত মিষ্ট কথা বলিল। ক্ষুদিরাম বুড়া মানুষ—একটু বিলম্বে আসিল; কিন্তু বৈঠকখানায় উঠিয়া আর চলিতে পারিল না—রাস্তার মধ্যেই তাহার জ্বর আসিয়াছিল। সে বৈঠকখানাতেই শুইয়া পড়িল। মানসী ও নলিন সংবাদ পাইয়া দৌড়িয়া আসিল। ডাক্তার ডাকা হইল;—ডাক্তার বলিলেন জ্বর বড় বেশী হইয়াছে—বিকারের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে। মানসী এই কথা শুনিয়া কাঁদিতে লাগিল, নলিন বিছানার পাশে মাথায় হাত দিয়া বসিল। রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় হরিনাম করিতে করিতে বোসেদের পুরাতন ভৃত্য দেহত্যাগ করিল—বোসেদের বাড়ী এতদিনে সত্য-সত্যই অন্ধকার হইল।

রমাঠাকুর

আমার নাম শ্রীরমাপ্রসাদ দেবশর্ম্মণঃ ভট্টাচার্য্য; পিতার নাম স্বর্গীয় রামকুমার ভট্টাচার্য্য; পিতামহের নামটা বলিতে একটু লজ্জা-বোধ হইতেছে। তোমরা মনে করিও না যে, আমার পিতামহ হয় ত কোন দুষ্কর্ম্ম করিয়াছিলেন, তাই তাঁহার নাম গোপন করিতেছি। তবে দুষ্কর্ম্ম তিনি না করুন, তাঁর পুত্র যে করিয়াছিলেন তাহা বলিতে পারি—নতুবা আমার ন্যায় পুত্র তাঁহাদের নাম ডুবাইবে কেন? আমি যজন-ব্যবসায়ী, গোমূর্খ ব্রাহ্মণ—আমার পিতামহ ছিলেন একজন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত—প্রসিদ্ধ অধ্যাপক! রামকমল বিদ্যালঙ্কারের নাম সে সময়ে হুগলী জেলার কে না জানিত? আর এখন যে দেশটা খ্রীষ্টানীতে ছাইয়া ফেলিয়াছে, এখনও আমাদের পাড়াগায়ে বিদ্যালঙ্কারের নাম উল্লেখ করিয়া সেকেলে বুড়োরা বলিয়া থাকেন—"হাঁ, একটা দিগ্‌গজ পণ্ডিত ছিলেন বটে।" সেইজন্যই পিতামহের নাম করিতে লজ্জা হয়,—একেবারে "কঃ সূর্য্যপ্রভব বংশ" আর কোথায় রমাপ্রসাদ ঠাকুর। লোকে ভট্টাচার্য্যও বলে না—বলে "রমাঠাকুর।"

পিতামহ ছিলেন মহাপণ্ডিত—পিতা সেই গর্ব্বে মুগ্ধবোধের সামান্য কয়েক পৃষ্ঠা পড়িয়াই পিতার নামে পণ্ডিত হইলেন; আমি তারপর আর কয়েক গ্রাম নামিয়া একেবারে বিদ্যাসাগরের দ্বিতীয়ভাগ পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়াই পাঠশালার চরণে প্রণাম করিয়া শ্রীরমাপ্রসাদ দেবশর্ম্মণঃ ভট্টাচার্য্য হইয়া বসিলাম।

পিতামহ অধ্যাপক ছিলেন, পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহার যথেষ্ট আয় ছিল;

বাড়ীতে চতুষ্পাঠী ছিল, বার মাসে তের পার্ব্বণের কিছুই বাদ যাইত না; অতিথি-অভ্যাগত কখন বিমুখ হইত না। তাঁহার যাহা আয় ছিল, তার অধিক তিনি ব্যয় করিতেন—কা'ল কি খাইবেন, সে ভাবনা তিনিও ভাবিতেন না, আমার পিতামহীও ভাবিতেন না,—যাঁহার ভাবনা তিনিই ভাবিয়া বিদ্যালঙ্কারের সংসার চালাইয়া দিতেন।

পিতামহ মহাশয়ের মৃত্যুর পরে পিতা মহাশয় যখন বাড়ীর কর্ত্তা হইলেন, তখন চতুষ্পাঠীটী প্রথমেই উঠিয়া গেল—দুই বেলা আহারের জন্য ত আর ছাত্র থাকিতে পারে না! পিতামহের নামের জোরে পিতা মহাশয়ও দুই একখানি পাত্রী পাইতে লাগিলেন, কিন্তু বিদায় আর তেমন পান না। তখন সংসার অচল হইল। পিতামহ কখন যজন করেন নাই—তাঁহার সে অবকাশ ছিল না—আবশ্যকও ছিল না। পিতা মহাশয় যজন আরম্ভ করিলেন, তবে তিনি ব্রাহ্মণ-গৃহেই পুরোহিতের কার্য্য করিতেন—শূদ্রের পৌরোহিত্য করিতেন না—এমন কি তিনি শূদ্রের দানও গ্রহণ করিতেন না। তখন হইতেই আমাদের কষ্টের আরম্ভ হইল। এখনকার দিনে লোকে ক্রিয়াকাণ্ড করিলে অন্যান্য বিষয়ে যথেষ্ট ব্যয় করিয়া থাকেন, কিন্তু ব্যয়সংক্ষেপ আসল ক্রিয়ার বেলায় —পুরোহিতের প্রাপ্য কম করাই এখন উদ্দেশ্য হইয়া পড়িয়াছে। প্রমাণ কাপড়ের পরিবর্ত্তে অনেকে দেড় হাত মার্কিণের গামছা দিয়াই কাজ সারিয়া থাকেন—দক্ষিণাও সেই হিসাবেই দেওয়া হয়। বিবাহাদি ক্রিয়ায় লক্ষ টাকা ব্যয় হয়, কিন্তু পুরোহিত ঠাকুর বড় বেশী হইলে আটটী টাকা প্রণামী পাইয়া থাকেন। এ অবস্থায় কেবল যজমানের উপর নির্ভর করিয়া সংসার চালাইতে প্রবৃত্ত হইয়া পিতা মহাশয় নানা প্রকার কষ্টে পড়িলেন। তবুও তিনি কোন প্রকারে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। তাহার পর তিনি অকালে সংসারের সমস্ত জ্বালা-যন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ

করিলেন। তখন আমার বয়স ১৮ বৎসর। পূর্ব্বেই বলিয়াছি বর্ণ-পরিচয় দ্বিতীয়ভাগ পর্য্যন্ত পড়িয়াই আমি মা-সরস্বতীর নিকট বিদায় গ্রহণ করি।

এখন হইলে কি হইত বলিতে পারি না, কিন্তু কুড়ি পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে আমাদের সময়ে লেখাপড়া না জানিলেও ব্রাহ্মণের ছেলের বিবাহ হইত—বাবা বাঁচিয়া থাকিতেই আমারও বিবাহ হইয়াছিল।

মাথার উপর বাবা, মা, ঠাকুরমা—আমার চিন্তা কি? আমি পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে ইয়ারকি দিয়াই সময় কাটাইতাম। বাবা মধ্যে মধ্যে শাসন করিবার চেষ্টা করিতেন বটে, কিন্তু ঠাকুরমার ভয়ে বড় কিছু করিয়া উঠিতে পারিতেন না। বাবা কিছু বলিলে ঠাকুরমা বলিতেন "যা যা, আর কর্ত্তাগিরি করিস্ না; বিদ্যালঙ্কারের নাতি না খাইয়া মরিবে না।" আমিও, এমন বাজে কথাটা যে বাবা বুঝিতেন না, সেজন্য বাবার বুদ্ধিটির অভাবই মনে করিতাম। এইভাবে দিন কাটিতে লাগিল। আমি কিছুই শিক্ষা করিলাম না। বাবা আড়াই প্রহর বেলার সময় গ্রামে গ্রামে যজমান-বাড়ী ঘুরিয়া যাহা লইয়া আসিতেন, আমি বিদ্যা-লঙ্কারের নাতি তাহাতে ভাগ বসাইতাম; দিন এক রকমে কাটিয়া যাইত। এমন সময় একদিন বাবার ওলাউঠা হইল, ডাক্তার আসিতে না আসিতেই বাবা সজ্ঞানে পরলোকে গমন করিলেন। তখন আমার চৈতন্যোদয় হইল। চাহিয়া দেখি বাড়ীতে খাইবার লোক আছে—বাহির হইতে আনিবার লোক নাই। বাড়ীতে মা, ঠাকুরমা, আমার স্ত্রী ও আমি এই চারি জন লোক—আর এই ভোজন-দ্রব্য যোগান দিবার জন্য পৃথিবী অনুসন্ধান করিয়া আর কাহাকেও পাইলাম না—পাইলাম সুধু পাঁচ বিঘা ব্রহ্মোত্তর জমি, আর আঠারো ঘর ব্রাহ্মণ যজমান; আর পাইলাম বাবার নাম দস্তখত-করা খতের ঋণ—বাবা গ্রামের মহাজন

হরিনাথ মণ্ডলের নিকট খত দিয়া চারিশত টাকা ধার করিয়াছিলেন, এত দিন তাহার এক পয়সাও শোধ দেন নাই,—সুদে আসলে সেই চারিশত টাকা ডবল ছাড়াইয়া গিয়াছে।

বাবার মৃত্যুর পরদিন প্রাতঃকালেই হরিনাথ মণ্ডল যখন আমাদের বাড়ীতে আসিলেন, তখন আমার মনে বড়ই সাহস হইল। আমি ত আর খতের কথা জানিতাম না, আমি মনে করিলাম মণ্ডলের পোর টাকা-কড়ি আছে; আমাদের এই দুর্দ্দিনে হয় ত কোন প্রকার সাহায্য করিবার জন্যই তাহার আগমন হইয়াছে। হরিনাথ মণ্ডল প্রথমে বাবার মৃত্যুর জন্য অনেক দুঃখ করিল; তার পরই একখানি খত বাহির করিয়া বলিল "তার পর ঠাকুর, এ টাকাগুলি শোধের কি হইবে, সুদে আসলে যে অনেক হইয়া গিয়াছে।" আমার তখন ইচ্ছা হইল মণ্ডলের পোর হাত হইতে খতখানি লইয়া ছিঁড়িয়া ফেলি এবং সুদের হিসাবে তাহার গণ্ড-দেশে বিরাশি-সিক্কার ওজনের দুই চড় বসাইয়া দিই। সৌভাগ্যক্রমে মণ্ডলের পোর গলার আওয়াজ পাইয়াই ঠাকুর-মা বাহিরে আসিতে-ছিলেন, তিনি সেই সময়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হরিনাথ মণ্ডল তাঁহাকেও খতের কথা বলিল। বুড়া ঠাকুর-মা এতগুলি টাকার কথা শুনিয়া একেবারে বসিয়া গেলেন—কিছুক্ষণ তাঁহার মুখ দিয়া কথা সরিল না। তাহার পর ধীরে ধীরে বলিলেন "দেখ হরি, রমা আমার ছেলে-মানুষ, সংসারের কিছুই জানে না। এই ছেলে বয়সে এত বড় সংসারটা মাথায় পড়িল। তা বাপু, কিছু দিন অপেক্ষা কর; টাকা মারা যাইবে না; বিদ্যালঙ্কারের নাতি কাহাকেও ফাঁকি দিবে না।"

"তা দেখ্‌বেন ঠাকরুণ, আমার হক্ টাকা। আপনার খাতিরে আমি আরও কিছুদিন সবুর করবো; তার পর কাজেই টাকা আদায়ের পথ দেখতে হবে।" এই বলিয়া হরিনাথ মণ্ডল চলিয়া গেল। আমি

পুরাতন চণ্ডীমণ্ডপের দাবায় বসিয়া দুই হাঁটুর মধ্যে মাথা দিয়া ভাবিতে লাগিলাম। একই ভাবনা, এই চারিটী প্রাণীর আহার জোটে কোথা হইতে! যজমানের বাড়ী কোন দিন যাই নাই, ক্রিয়াকর্ম্ম করিতেও শিখি নাই। বিদ্যালঙ্কারের নাতি—আহারের ভয় কি, ইহাই জানিতাম। এখন দেখি ঘোর সঙ্কট।

আমি ভাবিয়া কূল-কিনারা পাইলাম না, কিন্তু মাথার উপর বসিয়া আর একজন আমার জন্য ভাবিয়া সব ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন—সে ব্যবস্থা কি নড়চড় হইবার যো আছে! আমাদের গ্রামে আমার পিতারই প্রথম ওলাউঠা হইল; কিন্তু যে দেবী গ্রামে প্রবেশ করিলেন, তিনি আর শীঘ্র চলিয়া গেলেন না, গ্রামে আসন পাতিয়া বসিলেন। গ্রামের মধ্যে হাহাকার উঠিল, ঘরে ঘরে ওলাউঠা হইতে লাগিল, প্রতি বাড়ীতে তিন চারিটী করিয়া মরিতে লাগিল। আমি ভাবিতে লাগিলাম, আমাকে এই সময়ে পার করিলে আর কোনই ভাবনা থাকে না। মানুষ ভাবে এক, হয় আর এক। কামনা করিলাম আমার মৃত্যু—যম আসিয়া লইয়া গেলেন আমার কিশোরী পত্নীকে। তাহার পরদিনই পতি ও পুত্রবধূর শোকে কাতরা আমার জননী সেই পথে চলিয়া গেলেন। বাবার মৃত্যুর পরে আট দিনের মধ্যে আমার ভাবনা প্রায় শেষ হইল। যাহারা অনেক দিন থাকিবে বলিয়া আসিয়াছিল, তাহারা চলিয়া গেল; আর যিনি ভবসমুদ্রের তীরে বসিয়া খেয়া-নৌকার দিকে চাহিয়াছিলেন, সেই বুড়ী ঠাকুর-মা বাঁচিয়া রহিলেন—আর তাঁহার মুখে অন্তিম সময়ে গঙ্গাজল দিবার জন্য আমি রহিলাম। বুড়ী যদি এই সময়ে চলিয়া যাইত, তাহা হইলে আমি একেবারে নিশ্চিন্ত হইতাম। কিন্তু বিধাতার বিধান—আমি কি করিব।

মাসখানেকের মধ্যে আমাদের হরিরামপুরের পৌনে দুই শত

লোকের জীবন নাশ করিয়া ওলাদেবী গ্রামান্তরে চলিয়া গেলেন। গ্রামের 'হরিবোল' থামিল—ধীরে ধীরে কান্নাও থামিতে লাগিল। আবার সকলে গৃহকার্য্যে মন দিল। এই মহামারীতে আমার মহাজন হরিনাথ ও তাহার একমাত্র পুত্রও মারা গিয়াছিল। তাহাদের শ্রাদ্ধের পর হরিনাথের স্ত্রী একদিন আমাকে ডাকাইয়া লইয়া গেল এবং—আমার পিতার দত্ত সেই খতখানি বাহির করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল; বলিল "ঠাকুর, তোমার কিছু দেনা নাই, আমি সব ছাড়িয়া দিলাম।"

তাহার পর এই পনর বৎসর চলিয়া গিয়াছে। ঠাকুরমায়ের গঙ্গা-লাভ হইয়াছে। আমি এই পনর বৎসর একমেবাদ্বিতীয়ং হইয়া গ্রামে বাস করিতেছি। বিদ্যালঙ্কারের ভিটা কি সহজে ছাড়িতে পারি। পাঁচ বিঘা ব্রহ্মোত্তর আছে, তাতেই সংসার চলে। কত বড় সংসার জান? এই হরিরামপুর গ্রামটাই আমার সংসার, সকল বাড়ীই আমার বাড়ী। আমি আর শ্রীরমাপ্রসাদ দেবশর্ম্মণঃ ভট্টাচার্য্য নহি—আমি হরিরামপুরের রমাঠাকুর।

বাবা গেলেন, মা গেলেন, স্ত্রী গেলেন—শেষে বুড়ি ঠাকুর-মা ছিলেন, তিনিও গেলেন। আমি ভাবিলাম ভগবান্ আমার সকল বাঁধন কাটিয়া দিলেন—আমি এখন বৃষোৎসর্গের ষাঁড়ের মত পৃথিবীময় ঘুরিয়া বেড়াইব—যেখানে সন্ধ্যা হইবে সেখানেই রাত কাটাইব। কিন্তু ঐ যে বাবলা গাছের বেড়ার মধ্যে বিদ্যালঙ্কারের ভিটা, ঐ ভিটা যেন কি যাদুমন্ত্র জানে। আমি যেখানে যাইবার জন্য বাড়ীর বাহির হই—অমনি ঐ ভিটা আমাকে টানিতে থাকে—উঠানের সেফালিকার গাছ ডাকিতে থাকে—"আয় আয়"; ঘরের পিছনের আম গাছটা মাথা নাড়িয়া আমাকে ফিরাইয়া আনে। চারিদিক হইতে শত সহস্র ডাক পড়ে, আমি আর নড়িতে পারি না—ঐ বিদ্যালঙ্কারের ভিটায় সন্ধ্যা-বাতি দিই—ঐ বিদ্যা-

লঙ্কারের চতুষ্পাঠীতে একেলা বসিয়া গান করি—"তাইরে নারে নাইরে না।" আর অপরাহ্ণ হইলেই গ্রামের ছেলের পাল রমাঠাকুরের আড্ডায় আসিয়া হাস্য-পরিহাস করে, আমোদ-আনন্দ করে, উঠানে খেলা করে। সন্ধ্যা লাগিলে যে যার ঘরে চলিয়া যায়,—আর আমি ঐ চণ্ডীমণ্ডপের দরজায় বসিয়া আকাশের নক্ষত্র গণনা করি।

যজন-ব্যবসায় অনেক দিন ছাড়িয়া দিয়াছি। কাহার জন্য রোজগার করিব। যে কয়দিন বাঁচিব, বিদ্যালঙ্কারের ভিটায় প্রদীপ দেওয়াই আমার একমাত্র কর্ত্তব্য-কার্য্য স্থির করিয়া বসিয়া রহিয়াছি। কিন্তু কেমন গ্রহের ফের, বিবাহ আর করিলাম না—সংসারে বিদ্যালঙ্কারের ভিটা ও পাঁচ বিঘা ব্রহ্মোত্তর ছাড়া আর কোন জঞ্জাল ছিল না। আমি রমাঠাকুর বেশ নিশ্চিন্ত মনে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিতাম। কিন্তু মাথার উপর যে একজন আছেন—তিনি আমাকে কিছুতেই এক দরজায় বসিয়া থাকিতে দিবেন না। ব্রাহ্মণের ছেলে, বিদ্যালঙ্কারের নাতি—সকাল বেলায় উঠিয়া কোথায় পুষ্পচয়ন করিব, স্নান পূজা করিব—না ও-পাড়ার ঘোষেদের বুড়ী আসিয়া খবর দিয়া গেল "ও ঠাকুর, আমাদের টুনুর কাল রাত্রি থেকে জ্বর—বাছা সারারাত্রি ছট্‌ফট্ করিয়াছে।" পড়িয়া রহিল স্নান-আহ্নিক—চলিলাম ও-পাড়ায় ঘোষের বাড়ী। মহিম ঘোষের একমাত্র মেয়ে টুনুর জ্বর—আমি কি থাকিতে পারি। কবিরাজ আনিলাম, ডাক্তার ডাকিলাম;—সারাদিন মেয়েটীকে কোলে করিয়া বসিয়া থাকিলাম—স্নান-আহ্নিকও হইল না—আহার কারবারও ইচ্ছা হইল না। মধ্যরাত্রে জ্বর ছাড়িল—শেষরাত্রে বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম। মনে করিলাম—একটু ঘুমাই। তার কি যো আছে। রামকমল দাদার স্ত্রী আসিয়া কাঁদিয়া পড়িলেন—মেয়েটী আসন্নপ্রসবা—আজ দুই দিন বেদনায় কাতর—বুঝি মারা যায়। রাম-

কমল দাদা কলিকাতায় থাকেন—বাড়ীতে পুরুষ আর কেহ নাই। তখনই উঠিলাম, বাঁশের লাঠি ঘাড়ে করিয়া সেই অন্ধকার রাত্রে দেড় ক্রোশ মাঠ ভাঙ্গিয়া ডাক্তারের বাড়ী গেলাম, ধন্না দিয়া পড়িয়া থাকিয়া ডাক্তারকে লইয়া আসিলাম। সারা পথটা পাল্কীর সঙ্গে দৌড়ান কি সহজ কথা। মেয়েটী খালাস হইল—সোনারচাঁদ একটা খোকা হইল—তাহাকে দাদা বলিয়া ডাকিলাম—সে বুঝি রমাঠাকুরকে চিনিল—ওঁয়া—বলিয়া উত্তর দিল—আমার শরীর জুড়াইয়া গেল—বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম।

মুখুয্যেদের ছেলের অন্নপ্রাশন—ডাক রমাঠাকুরকে। এই হাতে আড়াই মণ ময়দা ভাজিয়া, লোকজন খাওয়াইয়া রাত্রি তিনটার সময় ফিরিলাম। কারো তোয়াক্কা রাখি না বাবা! কোন নেশার ধার ধারি না;—বিশ্বাস না হয় বিদ্যালঙ্কারের বাড়ী খানাতল্লাসি করিয়া দেখিও—একটা কলিকাও খুঁজিয়া পাইবে না। নেশার মধ্যে এক বেলা দুটো ভাত—দু'বেলা আহার করি না—তা যা দিয়ে হয় তাই খাই।

তাই মধ্যে মধ্যে মনে করি, দূর হোক, এ হরিরামপুর ছাড়িয়া যাই;—কিন্তু বিদ্যালঙ্কারের ভিটা ছাড়িতে পারি না;—তার পর এই গ্রামখানির সকলে জোট বাঁধিয়া আমাকে আটক করিয়াছে। আমারও মনে হয়, আমি না হইলে এদের চলে না; আমি যদি আজ হরিরামপুর ছাড়িয়া যাই, তাহা হইলে গ্রামের লোক সেই দিনই মরিয়া যাইবে। এরা মরুক না মরুক, আমি কিন্তু মিত্রদের ছোটো বৌয়ের খোকা, ঘোষেদের টুনু, মুখুয্যেদের রাণী, ও-পাড়ার মহেশ ধোবার বোবা মেয়েটাকে দিনান্তে না দেখিয়া মরিয়া যাইব। আর রমাঠাকুর না থাকিলে বিদ্যালঙ্কারের চণ্ডীমণ্ডপ যে আঁধার হইয়া যাইবে। ছেলেদের খেলার মাঠ জঙ্গলে পূর্ণ হইবে—তাদের আব্দারের স্থানই থাকিবে না।

এ সব ত ছিল ভাল—সুখে দুঃখে গাঁয়ের দশজনকে লইয়া এক

রকম দিন কাটিতেছিল। কিন্তু সেবার মুখুয্যে-বাড়ীর, মিত্র-বাড়ীর, রায়-বাড়ীর, আরও অনেক বাড়ীর যে সকল ছেলে কলিকাতায় কলেজে পড়ে, তারা গ্রামে আসিয়া মহা কোলাহল জুড়িয়া দিল—বিদ্যালঙ্কারের চণ্ডীমণ্ডপে এক সভা করিল; কি বক্তৃতা করিল তা বুঝিলাম না; শেষে সকলে বলিল "বন্দেমাতরম্"। তোমরা বিশ্বাস করিবে না, তোমরা বুঝিবে না—তোমাদিগকে বুঝাইতে পারিব না; ঐ "বন্দে—মাতরম্" শুনিয়া আমার প্রাণের মধ্যে যেন কেমন করিয়া উঠিল;—আমি চারিদিকে সুধুই শুনিতে লাগিলাম "বন্দে মাতরম্"—আমার বহু-দিনের শেফালিকা গাছ আঙ্গিনায় দাঁড়াইয়াছিল—সেও যেন বলিল "বন্দে মাতরম্।" অনেক মন্ত্র শুনিয়াছি, কিন্তু এমন মধুর নাম কোন দিন শুনি নাই।

সেই দিন হইতে আমি ঐ নাম গ্রহণ করিয়াছি, তোমরা নিন্দাই কর—আর যাই কর, এখন আমি জপ করি সুধু "বন্দে মাতরম্"।

আমি এক "বন্দে মাতরমের" দল বাঁধিয়াছি। পাড়ার যত ছোট ছোট ছেলে মেয়ে সন্ধ্যার সময় আমার আঙ্গিনায় আসে, আর হাততালি দিয়া গান করে—"বন্দে মাতরম্"। তোমরা পার ত একবার আমাদের গাঁয়ে আসিয়া রমাঠাকুরের দলের "বন্দে মাতরম্" শুনিয়া যাইও—আর বিদ্যালঙ্কারের নাতিকে দেখিয়া যাইও। তোমাদের নাকি নেতা নাই—আমাকে ঐ চাকরীটা দিতে পার? আমি কিন্তু বিদ্যালঙ্কারের ভিটা ছাড়িতে পারিব না—আগে হরিরামপুর উদ্ধার, তার পরে তোমার ভারত। আমরা এই বিদ্যালঙ্কারের চতুষ্পাঠীতে 'স্বরাজ্য' প্রতিষ্ঠা করিব—তোমাদের নিমন্ত্রণ করিলাম।

রঘুনাথ

(১)

আমি এখন রামগোপালপুর স্কুলের হেডমাষ্টার। এম্, এ, পাশ করিয়াছি, তাই আমাকে মাসিক আশি টাকা বেতন এবং থাকিবার জন্য একটা বাড়ী দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। বাড়ী না হইলেও আমার চলে, আর মাসিক আশি টাকা আমার সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য যথেষ্ট।

স্কুল-মাষ্টারী এই আমার নূতন। পূর্ব্বে আর একটা চাকরী করিয়াছি, কিন্তু সে চাকরী হইতে প্রমোসন পাইলে স্কুল মাষ্টার হয় না;— আমি ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট ছিলাম—হাকিম ছিলাম। স্বেচ্ছায় এত বড় একটা চাকরী ত্যাগ করিয়া এই মাষ্টারী গ্রহণ করিয়াছি।

চারি মাস পূর্ব্বেও আমি হাকিম ছিলাম—একটা সবডিবিসনের ভার আমার উপর ছিল। কতজন আমাকে সেলাম করিত। উপর-ওয়ালা মনিবদের কাছে প্রতিপত্তি লাভের জন্য দোষী হউক, নির্দ্দোষী হউক, আমার কাছে কেহ আসামী হইয়া আসিলে তাহার আর নিস্তার ছিল না—তাহাকে একবার শ্রীঘর দর্শন করিতেই হইত। তাহা না হইলে দুই বৎসরের মধ্যেই কি কাহারও কখনও আমার মত প্রমোসন হইয়াছে। তবুও সে মহাদুর্লভ হাকিমী ছাড়িয়া দিয়া এই মাষ্টারী লইয়াছি! যে চাকরী-লাভের জন্য লোকে কত ওমেদারী করে, কত সুপারিস সংগ্রহ করে, কতজনের শ্রীপদে তৈললেপন করে, পিতৃকুল

মাতৃকুল, শ্বশুরকুলে কেহ হাকিম থাকিলে সে কথার পুনঃপুনঃ উল্লেখ করিয়া ডেপুটীগিরিতে স্বত্ব সাব্যস্ত করিবার জন্য ব্যস্ত হয়, সেই চাকরী আমি বিনা তোষামোদে—কেবলমাত্র পরীক্ষা পাশ করিয়াই,—পাইয়াও ছিন্ন পাদুকার মত ছাড়িয়া দিয়াছি। পিতা মাতা ভ্রাতা ভগিনী স্ত্রী কেহ থাকিলে আমার জন্য হয় ত মধ্যমনারায়ণের ব্যবস্থা করিতেন। কিন্তু এ সংসারে আমার কেহই নাই। আমার বলিবার আছে আমি, আর আমার ভৃত্য রঘুনাথ। শৈশবে পিতৃহীন হই, জননীর ব্যবস্থার গুণে পিতৃত্যক্ত সামান্য জোত-জমার আয়েই আমার বিদ্যালাভ হয়। এম, এ পাশের পর ও ডেপুটী পরীক্ষার পূর্ব্বেই জননী স্বর্গারোহণ করেন। ভাল চাকরী হইলেই বিবাহ করিব, এই আশা দিয়াই স্নেহময়ী জননীকে পুত্রবধূর মুখদর্শন করিতে দিই নাই। তাহার পর যখন ডেপুটী হইলাম, তখন ডেপুটীর গৃহিণী হইবার স্পর্দ্ধা করিতে পারে এমন রমণীরত্ন বাছাই করিতে করিতেই দুই বৎসর কাটিয়া গেল। তাহার পর—তাহার পর ডেপুটীগিরি ত্যাগ—স্কুলমাষ্টারী গ্রহণ! এখন আর আমি বিবাহ করিতে প্রস্তুত নহি;—আর যাঁহারা ডেপুটীরত্ন জামাতা লাভের জন্য ওমেদার ছিলেন তাঁহারা আমার ভবিষ্যৎ-বাসের জন্য বাতুলাগারের ব্যবস্থা করিয়া প্রজাপতি ঠাকুরের সহিত পুনরায় পরামর্শ করিতে গিয়াছেন। বন্ধু-বান্ধবও আমার মস্তিষ্কবিকৃতি রোগ নির্ণয় করিয়া দূরে চলিয়া গিয়াছেন। সঙ্গে আছে কেবল আমার সুখের সুখী দুঃখের দুঃখী ভৃত্য বৃদ্ধ রঘু-নাথ। এমন দেবদুর্লভ চাকরী-ত্যাগের একটা কৈফিয়ত না দিলে হয় ত হিতৈষী বন্ধুবান্ধবেরা আমাকে সত্য সত্যই বাতুলালয়ে প্রেরণের বন্দো-বস্ত করিয়া ফেলেন; সেই ভয়েই আজ আমি আমার জীবনের এক অংশের কাহিনী বলিতে বসিয়াছি। এ কথা আর কেহই জানে না, জানি আমি, আর জানে আমার ভৃত্য বৃদ্ধ রঘুনাথ।

(২)

দরিদ্রের সন্তান আমি যেদিন হাকিমী পরওয়ানা পাইলাম, সেদিন সত্যসত্যই আমার মাথা ঘুরিয়া গেল। কোথায় বিষ্ণুপুরের স্বর্গীয় মদন-মোহন চৌধুরীর পুত্র আমি শ্রীনলিনীমোহন চৌধুরী—আর কোথায় শ্রীযুক্ত বাবু নলিনীমোহন চৌধুরী এম-এ, রায় বাহাদুর ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট। ইহাতে অনেক সহরবাসী ধনীপুত্রেরই মাথা ঘুরিয়া যায়, আমি ত বাঙ্গালা দেশের এক নগণ্য গ্রামের ততোধিক নগণ্য দরিদ্রের পুত্র।

পরওয়ানা পাইবামাত্রই আমি মনে মনে আমার ভবিষ্যৎ কার্য্যপ্রণালী স্থির করিয়া লইলাম। এমন জবরদস্ত হাকিম হইব যে, আমার প্রতাপে বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জলপান করিবে। যেখানে হাকিম হইব, সেখানকার মনুষ্য ত দূরে থাকুক পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ প্রভৃতি যাহাতে বুঝিতে পারে যে আমি হাকিম, তাহার জন্য যাহা করিতে হয় বিরত হইব না। মনে মনে স্থির করিলাম, ধর্ম্মাধর্ম্ম বিদ্যাবুদ্ধি সমস্তই গৌরাঙ্গপদে সমর্পণ করিয়া দেখিতে দেখিতে উন্নতির উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিব।

এমন ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা লইয়া যে ব্যক্তি কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়, তাহার সম্মুখে কোন প্রকার বাধা-বিপত্তিই থাকিতে পারে না—তাহার উন্নতি, তাহার পদবৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী।

ডেপুটীগিরিতে বহাল হইয়া প্রথম কয় মাস আমাকে দুই তিনটা জেলার সদরে থাকিতে হইয়াছিল। জেলার সদরে হাকিমী করিয়া মনের সুখ হয় না,—সেখানে যে হাকিমের উপর হাকিম থাকে—তার উপরে আবার হাকিম থাকে। বিশেষ ডেপুটী হইয়া যদি চারিদিকে হুকুম চালাইতেই না পারিলাম, তাহা হইলে আর হইল কি? কিন্তু একটা

দস্তর আছে, ডেপুটী হইয়া প্রথম কয় মাস শিক্ষানবিশী করিতে হয়। সেই শিক্ষানবিশীতে উত্তীর্ণ হইলে, পরে আসল ডেপুটীগিরির সুখানুভব করিতে পারা যায়। শিক্ষানবিশী ত ভারি—দুইবেলা কালেক্টর সাহেবকে বেশ গোছাইয়া সেলাম করা—আর এক কথা বলিতে গেলে তাহার মধ্যে দশটা 'ইওর অনার' বলা। কাজটা আর কঠিন কি? তবে তোমরা যদি মনুষ্যত্ব, আত্মসম্মানবোধ প্রভৃতি কতকগুলি কাল্পনিক কথার অবতারণা কর, তাহা হইলে তোমরা কোনদিনই ডেপুটী হইতে পারিবে না—এম-এ, পাশ করিয়াও শেষে এই আমার মত আশি টাকা বেতনে রামগোপালপুরের স্কুলের হেডমাষ্টারী করিতে হইবে।

সে কথা যাক্। এত সেলাম, এত 'ইওর অনার', এত স্তবপাঠ করিলে দেবতাও প্রসন্ন হন, সিভিলিয়ান হাকিম কালেক্টর ত একটা মানুষ। অল্পদিন পরেই কালেক্টর সাহেব আমার সম্বন্ধে খুব ভাল রিপোর্ট করিলেন—আমি যে স্বাধীনভাবে হাকিমগিরি করিবার উপযুক্ত হইয়াছি, এ কথা তিনি বলিয়াছিলেন। আমি একটা সবডিভিসনের ভার পাইলাম; সেই সবডিভিসনই আমার ডেপুটীগিরীর প্রথম ও শেষ লীলাক্ষেত্র। স্থানের নাম আর করিব না। যথাযোগ্য সাজ-সরঞ্জাম গোছাইয়া লইয়া সবডিভিসনে রাজত্ব করিতে গেলাম, সেখানে অন্য হাকিমের মধ্যে দুই জন মুন্সেফ। কিন্তু হাকিম হইলেও মুন্সেফ কি ডেপুটীর সমান! মুন্সেফ ত কেরাণীহাকিম; জনকয়েক পেয়াদা ও আফিসের আমলা ব্যতীত মুন্সেফের ক্ষুদ্র রাজ্যে অধিক প্রজা থাকে না; কিন্তু সবডিভিসনের ডেপুটী-হাকিম স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতে পারেন—"আমি দেশের রাজা।"

সুতরাং মুন্সেফ দুইটীর সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিলেও তাঁহাদিগকে সর্ব্বদাই বুঝিতে দিতাম যে, তাঁহাদের ও আমার মধ্যে 'প্রভেদ বিস্তর।'

বোধ হয় সেই জন্যই তাঁহারা আমার কাছে বড় একটা ঘেঁসিতেন না। তার পর উকিল মোক্তারের কথা, তাহারা ত আমার অপেক্ষা অনেক নীচে। থাকুক না আমার সবডিভিসনের চার পাঁচটা এম-এ, বি-এল, উকিল; কিন্তু তাহারা কি আমার সমান মানুষ। কোর্টে আসিয়া তাহাদিগকে 'ইওর অনার' বলিয়া অভিবাদন করিতে হয়—তাহাদের সঙ্গে কি আমি মিশিতে পারি; আর তাহা হইলে কি হাকিমি-পদের মর্য্যাদা রক্ষা করা যায়। এ দিকে আমার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে আমার সেই বিস্তৃত রাজ্য একেবারে কাঁপিয়া উঠিল; সাধু অসাধু সকলেই প্রমাদ গণিতে লাগিল। কখন কাহার উপর আমার কোপাগ্নি পতিত হয়, এই ভয়ে সকলেই অস্থির। যিনি হেড ক্লার্ক ও সেরেস্তাদার ছিলেন, তিনি আমার বাপের বয়সী; আমার মত পনের গণ্ডা ডেপুটীকে তিনি আরও দশ বৎসর কাজকর্ম্ম শিক্ষা দিতে পারেন; কিন্তু আমি মনে মনে তাহা বুঝিলেও মুখে কি সে কথা প্রকাশ করিতে পারি। তাই সেরেস্তাদারকে কোন দিন 'ওয়েল সেরেস্তাদার' ব্যতীত 'দেখুন রাধামাধব বাবু' বলিয়া সম্বোধন করি নাই; এবং সবজান্তার মত সকল কাজেই একটু নাক সিটকাইয়া তাঁহাকে নিতান্তই নগণ্য করিয়া দিতে লাগিলাম। উকিল মোক্তারগণের সহিত যে প্রকার ব্যবহার করিতাম, তাহা আর বলিব না। তবে কেহ আমাকে 'ঘটিরাম' বলিবার সুবিধা পায় নাই। আরও কিছু না হয় ত এম-এ পাশ করিয়াছি; আর কিছু শিখি আর না শিখি ফাজিল-চালাকী বেশ শিখিয়াছিলাম; সুতরাং ঘটিরাম নামে অভিহিত হইবার কোন্ কারণ ছিল না। তবে আমার অসাক্ষাতে অনেকে যে আমার সহিত অনেক মধুর সম্বন্ধ স্থাপন করিত, সে বিষয়ে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই।

মফঃস্বল-ভ্রমণে অর্থলাভও হয়, হাকিমীও বেশী করিয়া ফলান যায়; এই জন্য আমি সর্ব্বদাই মফঃস্বল-ভ্রমণ করিতাম। কিন্তু সেই মফঃস্বল-

ভ্রমণ আমার মঙ্গলের কারণ হইল। এই মফঃস্বল-ভ্রমণ করিতে গিয়াই আমি আমাকে ফিরিয়া পাইয়াছিলাম।

(৩)

আমার সবডিভিজনের মধ্যেই অনেক দূরে একটি ক্ষুদ্রকায়া নদীর তীরে একখানি সুন্দর ডাকবাংলা আছে। আমি প্রায়ই মফঃস্বল-ভ্রমণ করিতে গেলে সেই নির্জ্জন ডাকবাংলায় থাকিতাম। মাঠের ধারে নদীর ঠিক উপরেই বাংলা! চারিদিকে সুন্দর বাগান; সেই বাগানের চারিদিকে বড় বড় ঝাউগাছ মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া থাকিত, আর সামান্য একটু বাতাস বহিলেই সেই ঝাউগাছগুলির শর্ শর্ শব্দে নির্জ্জন বাংলা মুখর হইয়া উঠিত। বাংলার নিকট লোকালয় ছিল না; ছোট ছোট পল্লীগুলি দূরে আঁম কাঁঠালের জঙ্গলের মধ্যে লুকাইয়া থাকিত। সন্ধ্যার পর যখন অন্ধকার বেশ ঘনাইয়া আসিত, তখন সেই দূরপল্লী হইতে বাউলের গানের অস্পষ্টধ্বনি বাতাসে বহিয়া আসিত; আর শৃগালের চীৎকারে সেই জনশূন্য প্রান্তরের নৈশ-নীরবতা মধ্যে মধ্যে ভাঙ্গিয়া যাইত। আমি এই বাংলাখানি বড় ভালবাসিতাম। এই বাংলায় আসিলে আমার মন বড় শান্ত হইত। দিবসের কর্ম্মকোলাহল হইতে অবকাশলাভ করিয়া এই বাংলার নির্জ্জন নীরবতা আমি সত্যসত্যই উপভোগ করিতাম,—তখন আমার স্কন্ধ হইতে ডেপুটীর প্রেতাত্মা নামিয়া যাইত।

এই বাংলার একজন রক্ষক ছিল, তাহার নাম রঘুনাথ। রঘুনাথ অনেক দিন হইতে এই বাংলার রক্ষকের কার্য্য করিয়াছে। তাহার আত্মীয় স্বজন কেহ ছিল না। রঘুনাথ একাকী সেই নির্জ্জন বাংলায় থাকিত। যখন সেখানে হাকিমদিগের শুভাগমন হইত, তখনই যাহা কিছু

কাজ করিতে হইত, অন্য সময় সে ঐ বাংলায় তাহার অলস জীবন যাপন করিত।

আমি হাকিম, রঘুনাথ আমাকে ভয় করিত। দিনের বেলায় সে আমার যে মূর্ত্তি দেখিত, তাহাতে সে সাহস করিয়া আমার নিকট আসিত না! আমি যে ভাবে বিচরণ করিতাম, তাহাতে রঘুনাথ কেন, বড় বড় মহারথীও আমার নিকটস্থ হইতে সাহসী হইত না।

আমি দিবাভাগে সেই বাংলাতেই কাছারী করিতাম। সঙ্গে যে সকল আমলা আসিত, তাহারা এখানে আসিয়া কাছারীর কাজ করিত এবং অপরাহ্ণে দূর গ্রামে যাইয়া আশ্রয় লইত। বাংলায় থাকিত আমার চাকর, ব্রাহ্মণ, আরদালী; আর থাকিত বাংলার রক্ষক রঘুনাথ।

একদিন প্রাতঃকালে আমি বাংলার বারান্দায় বসিয়া আছি। সে দিন শুক্রবার। শনিবার পর্য্যন্ত এখানে কাছারী করিয়াই সেবার আমি হেড কোয়াটারে ফিরিয়া যাইব। হাতে বিশেষ কোন কাজ ছিল না; একখানি আরাম-কেদারায় অর্দ্ধশয়ান হইয়া মাথামুণ্ড কি ভাবিতেছি, এমন সময়ে শব্দ হইল "বাবু"। আমি চক্ষু চাহিয়া দেখি বারাণ্ডার নীচে একটী দুঃখিনী স্ত্রীলোক একটী দশ এগার বৎসরের ছেলের হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। আমি মনে করিলাম ভিখারী ভিক্ষা করিতে আসিয়াছে। আমি অতি রুক্ষস্বরে বলিলাম "যা যা মাগী, এখানে কিছু মিলিবে না।"

স্ত্রীলোকটী তখন অতি মৃদুস্বরে বলিল, "বাবুজি, আমি ভিক্ষা করিতে আসি নাই। আমার বড় বিপদ, তাই আপনার কাছে আসিয়াছি।"

স্ত্রীলোকটীর মুখের দিকে চাহিলাম; দেখিলাম তাহার চক্ষু দিয়া জল পড়িতেছে; তাহার ও ছেলেটীর আকার-প্রকার ও পরিচ্ছদ দেখিয়া বুঝিলাম তাহারা বড়ই দরিদ্র। আমার মনে একটু দয়ার সঞ্চার হইল। তখন জিজ্ঞাসা করিলাম, "ভিক্ষা চাও না, তবে কি চাও?"

স্ত্রীলোকটী বলিল "ভিক্ষা চাই। আমার যে বড় বিপদ। আমার স্বামীকে চোর বলিয়া থানার লোকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। আমার স্বামী চোর নহেন। আমারই জন্য তিনি চোর হইয়াছেন।" স্ত্রীলোকটী আর কিছু বলিতে পারিল না, কাঁদিয়া ফেলিল। আমি তখন রঘুনাথকে ডাকিলাম। রঘুনাথ হাতযোড় করিয়া আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। আমি বলিলাম "ওহে, একে ঐ দিকে লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা কর ত, ব্যাপার কি।" রঘুনাথ স্ত্রীলোকটীকে বাগানের এক পার্শ্বে ডাকিয়া লইয়া গেল। একটু পরেই রঘুনাথ ফিরিয়া আসিল, তাহার পশ্চাতে স্ত্রীলোকটীও ছেলের হাত ধরিয়া আসিল। রঘুনাথের মুখে শুনিলাম, স্ত্রীলোকটীর উপর গ্রামের পঞ্চায়েতের দৃষ্টি পড়িয়াছে; কিন্তু সে কিছুতেই পঞ্চায়েতের অসৎ প্রস্তাবে সম্মত হয় নাই; তাই ষড়যন্ত্র করিয়া তাহার স্বামীকে চোর বলিয়া ধরাইয়া দেওয়া হইয়াছে। আজ তাহার বিচারের দিন। স্ত্রীলোকটী সেইজন্য হুজুরের কৃপাভিক্ষা করিতে আসিয়াছে।

রঘুনাথের মুখে এই কথা শুনিয়া স্ত্রীলোকটীকে বলিলাম "এখন যা; তেমন প্রমাণ যদি না থাকে, তাহা হইলে তোর স্বামীকে ছাড়িয়া দিব।"

আমার এই কথা শুনিয়া স্ত্রীলোকটী সজলনয়নে হাতযোড় করিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া বলিল "ভগবান, তুমি—" তাহার মুখ দিয়া আর কথা বাহির হইল না। সে তখন গলায় অঞ্চল দিয়া আমাকে প্রণাম করিল এবং কাতরনয়নে আমার মুখের দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। তাহার সেই কাতর দৃষ্টি, তাহার সেই নীরব প্রার্থনা এখনও আমার প্রাণে জাগিতেছে!

যথাসময়ে কাছারী বসিল। পুলিস চুরী মোকদ্দমার সাক্ষী জোগাড় করিয়াছিল। সাক্ষীরা একবাক্যে বলিল রামকিশোর চোর! সাক্ষীদের

একটী কথারও নড়চড় হইল না ; আসামী, উকিল মোক্তার কিছুই দেয় নাই। আমিই সেই স্ত্রীলোকটীর কথা মনে করিয়া দুই চারিটী জেরা করিলাম। সাক্ষীরা অটল! তখন আমার ডেপুটী মেজাজ কেমন করিয়া ফিরিয়া আসিল—দয়া মায়া বিসর্জ্জন দিলাম ; রমণীর কাতর আবেদন ভুলিয়া গেলাম। হুকুম দিলাম—তিন মাস সশ্রম কারাবাস। হুকুম দিয়াই বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখি—বারান্দার নীচে সেই রমণী ছেলের হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সে তখনও বিচারফল শুনিতে পায় নাই ; পেস্কার হাঁকিয়া বলিল "তিনমাস জেল।" রমণী এই কথা শুনিয়া "হায় ভগবান, কি করিলে" বলিয়া পড়িয়া গেল। সকলে ধরাধরি করিয়া তাহাকে বাহিরে লইয়া গেল। আমি আর কাছারী করিতে পারিলাম না—আমার বুকের মধ্যে যেন কাঁপিয়া উঠিল, আমার কর্ণে যেন ধ্বনিত হইতে লাগিল "হায় ভগবান, কি করিলে!"

সকলকে বিদায় দিয়া আমি একাকী বিছানায় শুইয়া পড়িলাম। এতদিন এতলোকের দণ্ড দিয়াছি ; দোষী—নির্দ্দোষী কতজন আমার বিচারে কারাযন্ত্রণা ভোগ করিয়াছে—এখনও করিতেছে ; কিন্তু কৈ, কোন দিন ত আমার মনে এমন যন্ত্রণা হয় নাই। আমি শুইয়া শুইয়া ক্রমাগত শুনিতে লাগিলাম, কে বলিতেছে "হায় ভগবান, কি করিলে!"

সন্ধ্যার সময় অত্যন্ত বিষণ্ণমনে বারান্দায় আরাম-কেদারায় পড়িয়া আছি ; কিছুই ভাল লাগিতেছে না। এমন সময় ধীরে ধীরে রঘুনাথ আমার কেদারার নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। আজ কেন যে তাহার এতখানি সাহস হইল, তাহা সেই বলিতে পারে। বৃদ্ধ রঘুনাথ অতি মৃদুস্বরে বলিল "ধর্ম্মাবতারের কি কোন অসুখ করিয়াছে।"

রঘুনাথের এই সমবেদনাসূচক প্রশ্নে আমার মনের মধ্যে যেন কেমন করিয়া উঠিল। আমি বলিলাম "রঘু, আজ মনটা বড় ভাল

নাই। আচ্ছা রঘু, আজ যে লোকটার মেয়াদ হইল, সে কি সত্যসত্যই নির্দ্দোষী?" রঘুনাথ কোন উত্তর করিল না, আমার চেয়ারের পার্শ্বে ভূমিতলে বসিয়া পড়িল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "রঘু, অমন করিয়া বসিলে যে?" আমার স্বর বড়ই কাতরতা-ব্যঞ্জক। রঘু বলিল "ধর্ম্মাবতার, আমার জীবনেও ঐ রকম একটা ব্যাপার হইয়া গিয়াছে।" এই বলিয়াই রঘু দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিল। আমার মন তখন ভাল ছিল না; রঘুর জীবনের ইতিহাস শুনিবার জন্য আমার কেমন একটা আগ্রহ হইল। আমি বলিলাম "তোমার যদি আপত্তি না থাকে, তবে তোমার কথা আমাকে বল। আমার আজ কিছুই ভাল লাগিতেছে না।" রঘুনাথ তখন যাহা যাহা বলিয়াছিল, রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত একাগ্রচিত্তে আমি যাহা শুনিয়াছিলাম, তাহা নিম্নে বলিতেছি।

(৪)

রঘুনাথ আমার চেয়ারের পার্শ্বে ভূমিতলে উপবিষ্ট—আমি চেয়ারের উপর শয়ান। রঘুনাথকে তাহার জীবনের ইতিহাস বিবৃত করিতে বলিলাম বটে, কিন্তু সে কিছুতেই তাহার কথা আরম্ভ করিতে পারিল না। তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, সে যেন তাহার অতীত স্মৃতির সহিত নীরব সংগ্রামে প্রবৃত্ত। আমার মনে হইল এত দিন যে কথা সে তাহার হৃদয়ে সংগুপ্ত রাখিয়াছিল, আজ এক অপরিচিত যুবকের নিকট তাহা প্রকাশ করিতে সে নিতান্তই সঙ্কুচিত হইতেছে।

রঘুনাথের ভাব দেখিয়া আমার মনে দয়ার সঞ্চার হইল। আমি বলিলাম,—"রঘুনাথ পূর্ব্ব কথা বলিতে যদি তোমার মনে কষ্ট হয়——তাহাতে তোমার কোন সঙ্কোচের কারণ থাকে, তাহা হইলে সে কথা বলিয়া কাজ নাই।"

রঘুনাথ তখন ধীরে ধীরে মাথা তুলিল। চাহিয়া দেখি চক্ষের

জলে তাহার বুক ভাসিয়া যাইতেছে। তাহার এই অবস্থা দেখিয়া আমি ভুলিয়া গেলাম যে, আমি একজন ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট,—আমি একজন হাকিম,—আমি একজন বড়লোক। আমার হৃদয়ের মধ্যে এক অব্যক্ত যাতনা উচ্ছ্বসিত হইল। মনে হইল, রঘুনাথের কাহিনী হয় ত বড়ই শোকাবহ, বড়ই মর্ম্মভেদী। আমি চুপ করিয়াই বসিয়া রহিলাম। রঘুনাথ বলিল "বাবু! সে অনেক দিনের কথা, আমি তখন উনিশ, কুড়ি বছরের জোয়ান মরদ। আজ আমার নাম রঘু—তখন আর এ নাম ছিল না। আমি আজ দশ বৎসর এখানে আছি। এই দশ বৎসরই আমার নাম রঘু। বাপ মায়ে আমার নাম রাখিয়াছিলেন—হরেকৃষ্ণ। আমার বাড়ী ছিল অনেক দূরে। সে দেশের নাম না হয় নাই করিলাম। আর নাম করিলেও আপনি চিনিবেন না।

আমার বাপের জোত-জমি ছিল। আমি কৈবর্ত্তের ছেলে। কোন দিন লেখাপড়া শিখি নাই, লেখাপড়ায় আমাদের কি হইবে। বাড়ীতে বাবা আর মা, আর আমি ছিলাম। যা জোত-জমা ছিল, তাহাতেই তিন জন মানুষের বেশ চলিয়া যাইত।

আমার বয়স যখন উনিশ কি কুড়ি বৎসর, তখন আমার বিবাহ হইল। অনেক দূরের এক গ্রাম হইতে একজনের খুব সুন্দরী একটী ছোট মেয়ে আমার পরিবার হইল। তার পর পাঁচ ছয় বৎসর কোন্ দিক দিয়া কাটিয়া গেল, আমি তার হিসাবই রাখি নাই। চাষ করি, ধান তুলি, সংবৎসর খাই, যা বাঁচে তা বিক্রয় করি, বুড়া বাপমায়ের সেবা করি—এমনি করিয়া দিন কাটিয়া গেল। তার পর একবার আমাদের গাঁয়ে ওলাদেবীর কৃপা হইল—আমার বাপ মা দুইজনই মারা গেলেন। আমি তখন অকূল সমুদ্রে পড়িলাম। এ দিকে সেবার ক্ষেতে ধান জন্মিল না। চারিদিকে হাহাকার পড়িয়া গেল—আমার

ঘরেও অকাল দেখা দিল। তখন আর আমরা ঠিক ছুটি মানুষ নই, আমার পরিবার তখন গর্ভবতী, দু এক মাসের মধ্যেই তার সন্তান হওয়ার সম্ভাবনা। আমি বড়ই বিপদে পড়িলাম।

এদিকে, আমার একটি পুত্রসন্তান হইল। গরীবের ঘরের ছেলে, দেশে অকাল—তাহাকে কি খাইতে দিব সেই ভাবনা। আমরা স্ত্রীপুরুষে পরামর্শ করিলাম, আর দেশে থাকিয়া কাজ নাই, চল সহরে যাই। সেখানে দুইজন চাকুরী করিব, খোকাকে বাঁচাইব। এই পরামর্শ করিয়া সামান্য যা কিছু ছিল, পুঁটুলি বাঁধিয়া লইয়া একদিন শেষরাত্রে খোকাকে কোলে লইয়া আমরা দেশ ছাড়িয়া পলাইলাম। তিন দিন তিন রাত্রির পর বহু কষ্টে চার দিনের দিন আমরা যে সহরে এলাম, বাবুজি, তার নামও আপনার কাছে বলিব না।

সহরে ঢুকিতেই প্রথমে দেখিলাম একটা বাগান—বাগানের মধ্যে একখানি বাংলা। বাংলাখানি দেখিতে বেশ। মনে হইল, এই বাগানে গেলে হয় ত আমাদের আশ্রয় মিলিবে। আমার পরিবার ও ছেলেটিকে বাহিরের একটা গাছতলায় বসাইয়া রাখিয়া আমি আস্তে আস্তে সেই বাগানের মধ্যে গেলাম। রাস্তা ধরিয়া ধরিয়া একেবারে বাংলার সম্মুখেই উপস্থিত হইলাম। এই আপনি যেমন আছেন, বাংলার বারান্দার উপরে এই আপনারই সমবয়সী একটি বাবু বসিয়া ছিলেন। আমাকে দেখিয়াই বাবু বলিলেন "কি হে, কি চাই?" আমি বলিলাম, "বাবু বড় গরীব, খেতে পাই না। অনেক দূর হইতে আসিয়াছি, একটা চাকুরীর প্রার্থনা করি।" বাবু বলিলেন, "তোকে কে চেনে?" আমি হঠাৎ বলিয়া ফেলিলাম—"বাইরে গাছতলায় আমার পরিবার বসিয়া আছে, সেই আমায় চেনে।" আমার কথা শুনিয়া বাবু হাসিয়া বলিলেন "তবে তোরা স্ত্রীপুরুষেই চাকরী করবি।" আমি বলিলাম

"হুজুর যদি দুজনকেই রাখেন, তবে ভালই হয়।" বাবু বলিলেন, "বেশ, মাইনে টাইনে পাবিনে, দুজনে খাবি, আর কাজকর্ম্ম করবি। আমার স্ত্রী এখানে আছেন, তোর পরিবারকে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দে।"

সেই দিন থেকেই আমরা সপরিবারে বাবুর চাকুরীতে বাহাল হইলাম। সেই দিনই আমার অদৃষ্ট ভাঙ্গিল। বাবু ঐ সহরের ডিপুটী বাবু। এই আপনি যেমন তিনিও তেমনি। তাঁর চেহারা দেখ্‌লেই তাঁকে ভারি বদ লোক বলে মনে হইত। চেহারাও যেমন বদ, স্বভাবও তেমনি খারাপ। তা ব'লে আমি কি করব।

বাবু দেখ্‌তে যেমন কুৎসিত, বাবুর স্ত্রী তেমনি পরমা সুন্দরী। বাবুজি, মনে কিছু করবেন না, আমার স্ত্রীর কথাটাও এখানে ব'লে রাখি। কৈবর্ত্তের ঘরের মেয়েই বটে, কিন্তু অমন সুন্দরী, অমন সতী লক্ষ্মী আপনাদের বড় ঘরেও নাই।

বাবু ডেপুটী হইলে কি হয়, বড় ঘরের ছেলে হইলে কি হয়, স্বভাবটা বড়ই ইতরের মত। ঘরে এমন সতী লক্ষ্মী বৌমা, বাবু কিন্তু ঘরে থাকিতেন না। সারা রাত্রি এদিক ওদিক মাতলামি করে বেড়াতেন, আর মা লক্ষ্মী ঘরে ব'সে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলতেন। বাগানের পাশে একখানি ছোট ঘর ছিল, তাতেই আমি সপরিবারে বাস করতেম। বাবু বড়মানুষ, তাঁর বাড়ীতে থেকে, ভাল খেয়ে-দেয়ে, আমার স্ত্রীর রূপ আরও বাড়িয়া উঠিল। বাবুজি, মনে কিছু করবেন না। এমন রূপ আমি কখনও দেখি নাই। কত বড়মানুষের মেয়ে দেখিলাম, কিন্তু অমন রূপ কখনও দেখি নাই। বলেছি ওই রূপই আমার কাল হইল।

একদিন আমার স্ত্রী বলিলেন, "দেখ বাবুর রকম সকম, চাউনি বড় ভাল নয়। আমার দিকে কেমন করে চেয়ে থাকেন,—আমার বড় ভয় করে। চল, আমরা এখান হইতে চলিয়া যাই।" আমি

বলিলাম, "সে কি কথা ; বাবু বড়মানুষ, আমাদের গরীবের উপর তাঁর কি নজর পড়তে পারে ? ও-সব তোমার মিথ্যা ভয়।" আমি সেই সময় যদি সতী-লক্ষ্মীর কথা শুনিতাম, তা'হলে এই বুড়োবয়সে এই কষ্ট পাইতাম না। একদিন বাবুর ঘাড়ে সয়তান ভর করিল। আমি সে দিন সন্ধ্যার সময় বাজারে গিয়াছিলাম, বাবু সেই অবকাশে আমার পরিবারকে খারাপ পথে লইবার চেষ্টা করেন। বলেছি ত, আমার পরিবার সতী-লক্ষ্মী। তার তখন এমন রাগ হইয়াছিল যে, সে রাগের মাথায় বাবুকে অনেক কড়া কথা শুনাইয়া দেয়। এমন কি লাথি মারিয়া তাঁহার মুখ ভাঙ্গিয়া দিবে, সে কথাও বলে। বাবু নাকি রাগে ফুলিতে ফুলিতে চলিয়া যান। আমি বাড়ী আসিয়া যখন শুনিলাম এই কাণ্ড হইয়া গিয়াছে, তখন আমারও রাগ হইল। একবার ইচ্ছা হইল বাবুটাকে ঘা-কতক দিয়া তখনই বাগান হইতে বাহির হইয়া যাই। কিন্তু আমার স্ত্রী নিষেধ করিলেন ; তিনি বলিলেন, "রাত্রিটা কাটুক, প্রাতে যা হয় করা যাইবে।" হায় ! হায় ! সেই রাত্রেই যদি আমরা পলায়ন করিতাম।

প্রাতে উঠিয়াই শুনি, বাংলায় মহা গোলমাল ; বৌ-মার অলঙ্কারের বাক্স পাওয়া যায় না। চারিদিকে খোঁজ আরম্ভ হইল। ডেপুটীর বাড়ী চুরী ;—পুলিস আসিয়া ধূমধাম আরম্ভ করিয়া দিল। বাবু বলিলেন, "আর কারো উপর ত সন্দেহ হয় না, তবে রাত্রে হরেকৃষ্ণ একবার আমার শোবার ঘরে এসেছিল।" পুলিস তখন আমার সেই ঘর তল্লাস করিতে আসিলেন। ঘরে কিছু পাওয়া গেল না। ঘরের পিছনেই একটী স্থানের মাটি আল্‌গা দেখিয়া পুলিশের সন্দেহ হইল। সেই স্থানের মাটি তুলিয়া দেখে, তাহার মধ্যে অলঙ্কারের বাক্স রহিয়াছে। অমনি দারোগা বাবু এক লম্ফে আসিয়া আমাকে

চোর বলিয়া ধরিলেন, হাতকড়ি দিলেন; আমার একটি কথাও শুনিলেন না। আমার স্ত্রীর ক্রন্দন, আমার ছেলের কাতর মুখ, কিছুতেই তাঁদের মন গলিল না। চিরকালের মত চোর অপবাদ লইয়া আমি হাজতে গেলাম। আর একজন ডেপুটীর কাছে আমার বিচার হইল; আমার বাবু আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলেন—আমার তিন মাসের জেল হইল। কাঁদিতে কাঁদিতে জেলে গেলাম। স্ত্রী-পুত্রের মুখ একবারও দেখিতে পাইলাম না। এ জীবনে আর তাদের সঙ্গে দেখা হইল না। তিন মাসে তাহাদের কি অবস্থা হইল তাহাও তখন জানিতে পারিলাম না। তিন মাস পরে খালাস হইয়া কত দিকে তাহাদের খোঁজ করিলাম, কেহই কিছু বলিতে পারিল না। তাহার পর পাঁচ বৎসর দেশে দেশে বেড়াইয়াছি, কত স্থানে তাহাদের খুঁজিয়াছি—কোথাও তাহাদের তত্ত্ব মিলিল না। হয় ত, অনাহারেই তাহাদের প্রাণ গিয়াছে। যখন কিছুতেই আমার স্ত্রীপুত্রের উদ্দেশ পাইলাম না, তখন সেই ডেপুটীর উপর আমার রাগ হইল; আমি সেই ডেপুটীর খোঁজ আরম্ভ করিলাম। সে আজ দশ বৎসরের কথা। খুঁজিয়া আপনি যেখানকার হাকিম, সেইখানে আসিয়া তাঁহাকে পাইলাম। এত দিন পরে আমায় চিনিবার যো ছিল না—তবুও আমি সেখানে না থাকিয়া এই দিকে চলিয়া আসিলাম। বাংলায় একজন বুড়া পাহারাওয়ালা ছিল, তাহারই আশ্রয় লাভ করিলাম। রঘুনাথ নাম বলিয়া তাহার কাছে পরিচিত হইলাম। বুড়ার কেহ ছিল না, আমিই তাহার সহায় হইলাম। তিন মাস পরেই বুড়া মরিয়া গেল, আমি এই বাংলার রক্ষক হইলাম।

আমার চাকুরী পাওয়ার মাস দুই পরে আপনি যেমন আসিয়াছেন, সেই পাষণ্ড ডেপুটীও তেমনি এখানে আসিয়াছিল। আমার

স্ত্রীপুত্রের কথা তখনও আমার বুকের মধ্যে জ্বলিতেছিল। একবার মনে হইল, এই ডেপুটীর রক্ত দেখিলেই প্রাণ শীতল হয়। কিন্তু মনে বড় ভয় হইল। কত পাপ করিয়াছি, তাহারই ফলে এই যন্ত্রণা, আবার পাপ করিতে যাইব। দুই দিন এই সব কথাই মনে তোলপাড় করিলাম। শেষ দিনে স্থির করিলাম, ডেপুটীকে মারিয়া ফেলিয়া জঙ্গলে পলাইয়া যাইব। করিতামও তাই, কিন্তু সেই দিন সদর হইতে সংবাদ আসায় হঠাৎ ডেপুটী চলিয়া গেল। আমার আর প্রতিশোধ লওয়া হইল না। ঐ ডেপুটীর উপরে প্রতিশোধ লইবার জন্যই আমি এতকাল এখানে বসিয়া আছি। কে যেন সর্ব্বদাই আমাকে বলে, "এখানেই ঐ ডেপুটীর রক্তে আমার স্ত্রীপুত্রের তর্পণ হইবে।" বাবুজি, তুমিও ডেপুটী, সেও ডেপুটী ছিল। বলিতে পার, সে ডিপুটী কোথায় আছে। আমি আর বেশী দিন বাঁচিব না। একবার তাহার সহিত বোঝাপড়া হইলেই চলিয়া যাই।"

রঘুনাথ আর কিছু বলিতে পারিল না। আমিও এতক্ষণ তন্ময় হইয়া তাহার কথা শুনিতেছিলাম। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"রঘুনাথ, আর কিছু বল না বল, সেই ডেপুটীর নাম আমাকে বলিতে হইবে।" রঘুনাথ প্রথমে কিছুতেই বলিতে চাহে না; অবশেষে অনেক পীড়াপীড়ি করিবার পর সে ডেপুটী বাবুর নামটি করিল। আমি শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলাম; ঐ ডেপুটীর কন্যার সহিতই আমার বিবাহের কথা হইতেছিল, কথা কেন, এক রকম আমি মনে মনে স্থিরই করিয়াছিলাম। এই ডেপুটী কি সেই ডেপুটী—আমি রঘুনাথের নিকট আর কোন কথা ভাঙ্গিলাম না। ডেপুটী-গিরির উপরই আমার কেমন অশ্রদ্ধা হইল। তখন শুধুই সেই দিনের কথা মনে হইতে লাগিল "ভগবান, কি করিলে!" ধীরে

ধীরে শয়ন করিতে গেলাম। রঘুনাথ নিজের কাজে চলিয়া গেল। সমস্ত রাত্রি আমার কিছুতেই নিদ্রা হইল না। শুধু রঘুনাথের কথা ভাবি, আর থাকিয়া থাকিয়া গভীর রাত্রের নীরবতা ভঙ্গ করিয়া সেই কাতরকণ্ঠের মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ আমার কর্ণে পৌঁছে "হায় ভগবান! কি করিলে! সমস্ত রাত্রি অবিশ্রান্ত আমি কেবল ঐ কথাই শুনিতে লাগিলাম। প্রাতে উঠিয়া রঘুনাথকে বলিলাম, "রঘুনাথ, পাপীর দণ্ড দিবার তুমিও কেহ নও, আমিও কেহ নই। চল রঘুনাথ, আমার সঙ্গে; আমি এ পাপের কাজ ত্যাগ করিব। গতকল্য দুঃখিনী স্ত্রীলোকের নির্দ্দোষ স্বামীকে কারাগারে পাঠাইয়া আমি বুঝিয়াছি, কি অধর্ম্ম করিলাম। পাপীর দণ্ড দিবার আমি কে? চল, আমার সঙ্গে চল।"

রঘুনাথ আমার সঙ্গী হইল। আমি সদরে আসিয়া এত সাধের ডেপুটীগিরিতে ইস্তাফা দিলাম। তাহার পর—তাহার পর রাম-গোপালপুরের হেড্-মাষ্টার। তোমাদের ইচ্ছা হয়, আমার জন্য মধ্যমনারায়ণের ব্যবস্থা করিতে পার, কিন্তু আমি অহোরাত্র শুনিতেছি, কে যেন কাতর কণ্ঠে আর্ত্তনাদ করিতেছে,—"ভগবান, কি করিলে!"

সমাপ্ত।

নূতন গিন্নী

দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীজলধর সেন।

১ লা আশ্বিন

১৩১৪